জনান্তিকে

অজিত দত্ত

শ্রীভূপতি চৌধুরী

প্রিয়বরেষু

অজিত দত্ত

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬

সূচীপত্র

ভ্রমণকাহিনীর ভূমিকা

এইমাত্র ঘুরে' এলাম টোকিও, কিয়োটো, য়োকোহামা শহর। তারপর ভোল্গা নদী পাড়ি দিয়ে, মস্কো-লেনিনগ্রাড্-এর উপর দিয়ে, ইস্তাম্বুল শহর ঘুরে', বোগদাদ-বোখারা-সমরকন্দ দেখে, মোম্বাসার বন্দর পেরিয়ে একেবারে রাসবিহারী এভিনিউ-এর তিনতলায়। দেখলাম মিশর, মিসিসিপি, মিনেসোটা; আল্প্স্ পাহাড় পেরিয়ে গেলাম লিস্বন, পেরুলাম কাঞ্চনজঙ্ঘা। এমনি আমার ভ্রমণের নেশা। যাকে বলে মহা-ভবঘুরেস্তর পথে। কিন্তু কেউ যদি আজ, কিংবা যে-কোনো দিন, সন্ধ্যায়, কিংবা যে কোনো সময়ে, আমাকে এসে বলে 'চলো সিনেমা দেখে আসি', তাহলে আমি কেবল পাশ ফিরে শোবো।

তার কারণ, ঘুরে বেড়াতেই আমার ভালো লাগে, আর নিশ্চিন্ত আরামে হাত পা ছড়িয়ে না শুলে আমার ঘোরাই হয় না। ভ্রমণ-কাহিনী লিখতে না হওয়ার এ একটা মস্ত সুবিধা, এবং এ-সুবিধার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহারই আমি করে' থাকি।

ভ্রমণকাহিনী জিনিসটা অবশ্য খুব ভালোই, এবং শুনেছি যথোপযুক্ত কল্পনাশক্তি খাটাতে পারলে নাকি কাটেও খুব। কিন্তু তার ভূমিকা বড়ই ভয়াবহ। মনে করুন, কোনো এক বিখ্যাত লেখকের কাছে, কোনো এক বিখ্যাত প্রকাশকের কাছ থেকে একখানি ভ্রমণকাহিনী লেখবার ফরমায়েশ এসেছে। সামনেই বড়দিনের ছুটি। বিখ্যাত লেখক অতএব স্থির করলেন, কলকাতার বাইরে যাবেন।

বন্ধু-বান্ধবদের কাছে, বন্ধু-বান্ধবদের স্ত্রীদের কাছে, আত্মীয় ও আত্মীয়াদের কাছে এবং অনাত্মীয় ও অর্ধপরিচিতদের কাছে সগর্বে এবং সস্মিত মুখে বলে বেড়ালেন, — 'কদিনের জন্য বাইরে যাবো ভাবছি'। উদ্দেশ্য সকলকে যথাসম্ভব ঈর্ষ্যান্বিত করা। কিন্তু সকালে বন্ধু-বান্ধবরা যখনো এসে পৌঁছোয় না এবং রাত্রে বন্ধুবান্ধবরা যখন চলে যায়, তখন বাড়িতে বিখ্যাত লেখক এবং তাঁর স্ত্রী গালে হাত দিয়ে বসেন যাকে বলে 'ভয়াবহ ভবিষ্যৎ'-এর চিন্তায় শঙ্কাকুল। ট্রেইনে ছোটো মেয়েটার দুধ গরম করার কী ব্যবস্থা করা যেতে পারে, এবং চারটে বাক্স, তিনটে বিছানা, দুটো ধামা, একটা কুঁজো, এবং ন'খানা আনুষঙ্গিক খুচরো মোট নিয়ে কি উপায়ে আসানসোলে গাড়ি বদল করা যেতে পারে, এসব চিন্তা পরলোকের চিন্তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ। তার উপর বিদেশের বিজাতীয় হালচাল এবং বিখ্যাত লেখকের আসাধারণ হিন্দি জ্ঞানের সমন্বয়ে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তাতে রোমাঞ্চিত না হওয়াই অস্বাভাবিক। আমরা যথারীতি রোমাঞ্চিত হয়ে বলি 'সত্যি তুমি কী ভাগ্যবান, কত ঘুরচো!' যেন ইঞ্জিনের চাকা হওয়াতেই মানব জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা।

আমার ছেলেবেলা থেকেই একটা বদ্ধমূল ধারণা যে যারা কেবলি ঘোরে তাদের ঘোরা হয় না, যারা ক্রমাগতই বেড়িয়ে বেড়ায় — বেড়ানোর প্রকৃত মর্ম তারা জানেনি। বড় বড় ট্রেইন ভ্রমণ করা যাদের অভ্যাস, ড্রয়িং-রুমের প্রতি আকর্ষণ তাদের অসাধারণ। দু'পাশের জলে ডোবা ধানের ক্ষেতের একটু দূরে ব্যাঁকা-চোরা ডোবাটায়, পানার আল্পনা আঁকা টলটলে জলের এক পাশটিতে যে দুধবরণ বকটা এক ঠ্যাং তুলে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকে,

খোঁজ নিয়ে জানবেন, ওটা তাদের চোখেই পড়ে নি; আবার শীতে, শুকনো মাঠে কাটা ধানের হলদে আঁটির সারি — আর ভূতের কালো মাথার মত হাঁড়ি-বাঁধা এবড়ো-খেবড়ো খেঁজুর গাছ, একটা এখানে একটা সেখানে — মোটেই 'ছবির মতো সাজানো' নয়, বরং ছবি আঁকবার মতো — সেই দেখাটি তাদের মনে হারিয়ে গেছে। আমি অনেক কষ্টে বছরে একখানা করে' ছবি দেখে আসি, তাই সে-ছবি আমার মনে সোনার ফ্রেমে বাঁধাই হয়ে থাকে, তাতে মরচে ধরে না। আমার দৌড় এই গ্রীষ্মে গিরিডি, আবার ও-ই শীতে শান্তি-নিকেতন; কচিৎ কোনো বার বা বিক্রমপুরের জোলো জোলো দেশ — যা মনের প্রাগৈতিহাসিক মেছো জীবটিকে ডানা ধরে' নাড়া দিয়ে যায়। অনেকটা টিকি ধরে' টানার মতো। কষ্ট হয় — খুবই কষ্ট হয়, এবং বাড়ি ফিরে কাগজে-কলমে এত চেঁচাই যে অনেকগুলো লেখা চটপট তৈরি হয়ে যায়। এ-ও এক সাধনা ছাড়া আর কি! জাপানীরা চা খেতে যে সাধনা করে এ সেরকম সাধনা নয়, বরং রোদ্দুরে ঘেমে সতেরোজন বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে নিজের হাতে স্টোভ ধরিয়ে চা খাওয়ার আনন্দ উপভোগ করার মতো।

বন্ধুবান্ধবরা আমাকে কুড়ে বলে' আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে। তা করুক। অন্যকে গাল দেওয়া মানেই তুলনায় নিজেকে খানিকটা বড় করা কিনা! যেন কুড়ে হতে সকলেই পারে। বাইরের প্রকৃতি, এমনকি দালান-কোঠা, যন্ত্রপাতি — চোখ মেলে তাকালে যা কিছু চোখে পড়ে — তার সঙ্গে অন্তরের একটা অবিচ্ছেদ্য অনির্বচনীয় মিল না থাকলে কেউ কোনোদিন সত্যিকারের আলসেমি করতে পেরেছে? সুরের সঙ্গে সুর যেমন ক'রে মিশে যায় তেমনিভাবে

বাইরের সঙ্গে মনের মিল না হ'লে কি আর আলস্য-যাপন করা যায়? তাই আপিস থেকে ফিরে আমি হাত পা ছড়িয়ে শুই, তারপর চোখ ছেড়ে দি আকাশে, মেঘে, অথবা ছুটো পাখী — নিদেন ঘরের দেয়ালে টিকটিকিগুলোর দিকে। তখন — এবং তখনই আমি হয়ে যাই পৃথিবীর অংশ, লুসির মতো —

Rolled round the Earth's diurnal course

With rocks and stones and trees.

সে-ও এক ভ্রমণ ছাড়া আর কী? একেবারে পরিভ্রমণ, কিম্বা পরিক্রমণও বলা যেতে পারে।

তা' ছাড়া, ভ্রমণ যে আমি একেবারেই করিনা তাতো নয়। এই যে রোজ ট্রামগাড়ি চড়ে চার মাইল রাস্তা পেরিয়ে আপিসে যাই, আবার চার মাইল অতিক্রম ক'রে বাড়ি ফিরি — এর ভিতরে যদি ভ্রমণের আনন্দ না থাকে তবে আটশো মাইল ক্রমাগত রেলগাড়ি চড়ে বেড়ানোও নিরর্থক। যে দেখতে জানে সে-ই ছাখে; হগমার্কেটে যে-ফুলওয়ালা লাখো ফুলের মধ্যে বসে ফুলের নাম, ধাম এবং দাম মুখস্থ রাখে সেই কি আমার চেয়ে ফুলের মর্ম বেশি বোঝে? ট্রাম গাড়িতে বসে আমি তো একই রাস্তায় দু' হাজার বার গেছি আর এসেছি, এসেছি আর গেছি, তবু আমার দেখা কিন্তু ফুরোয় নি। এই যে বড় পার্কের পাশের স্টপ-এ মোটা মোটা কেতাব হাতে আটোসাঁটো মেয়েটি জোরে জোরে পা ফেলে ট্রামে উঠেই কোনো দিকে না তাকিয়ে মহিলা-মার্কা সীট্‌টা দখল করে সব চেয়ে মোটা বইটা খুলে বসলো — যেন হেড মিস্‌ট্রেস্ ক্লাস্ রুমে ঢুকলেন — এ-ও যেমন ছাখবার মতো, আবার কালিঘাটে নাদুস-নুদুস বাবুটি যে অন্যকে বসতে দেবার জন্য সীট

থেকে রোমশ পা-টা নামাতে হোলো বলে মদনভস্মের পুনরভিনয় করবার চেষ্টা করতে লাগলেন সেটাও কম উপভোগ্য নয়। কোনোদিন বা ওই 'লেডিজ' মার্কা সীটটাতেই দেখি এলো করে খোঁপা বাঁধা কলেজী তরুণী, আবার কোনোদিন বা চাকুরি-গর্বিতা দো-আঁশলা মেম-সাহেব। আবার কোনো দিন ঘুমন্ত ছেলে কোলে নতুন মা'টির অবসন্ন ভঙ্গীটিও বেশ। যা-ই দেখি, দেখতে ভালোই লাগে। তারপর শহর ছেড়ে ট্রাম যখন চৌরঙ্গির মেঠো পথে পাড়ি দেয়, তখন তো আর ছবির শেষ নেই। কোনো চিত্রকর যদি ওই মাঠের কোনো এক কোনে কুটির বেঁধে থাকতো, ওই মাঠের নানান্ কোন থেকে, মাঠ-বিহারী নানান্ লোককে নিয়ে সে হয়তো পঞ্চাশখানা ছবিই এঁকে ফেলতো। তা' দেখে কেউ বলতো না, 'ছোঃ, ওই তো এক মাঠের ছবি, এ আর দেখবো কি!' ক্যামেরা নিয়ে ফোটোগ্রাফার ওই মাঠের থেকে হাজারো ছবির টুকরো কুড়িয়ে আনতে পারে, কেননা ওই মাঠের যে রূপ সে তো ক্ষণে বদলায় মানুষের পদক্ষেপে। আমি হেঁটে গেলে গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে আমাকে সুদ্ধ যে-ছবিটা চোখে পড়বে, একটু পরেই হাসতে হাসতে তিনটি মেয়ে যখন ঐ পথ ধরেই যাবে তখন আর একটা গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলেই দেখতে পাবেন বিলকুল আলাদা ছবি, যেন আরেক দেশ।

ভাবতে গেলে জীবনে কতটুকুই দেখলাম। এতবড় পৃথিবী, অথচ আমার কেন্দ্র ছেড়ে হাজার মাইল যদি গিয়েছি তো ঢের। কিন্তু আরো ভাবতে গেলে কী-ই বা দেখিনি! এই গাছ পাতা আর আকাশ; এই আকাশের নীল রং যা আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে একদিন ধসর হয়ে যায়, তারপর হঠাৎ এক আশ্বিনে তাকিয়ে

দেখি রাতারাতি আকাশে কে নীল রং মাখিয়ে দিয়ে গেছে, 'কঙ্কাবতী'র ভুতিনী মাসীর মতো ; এই পাখী, আর অলস মধ্যাহ্নে পাখীর ডাক ; এই নদী আর সমুদ্র ; — কী-ই বা দেখিনি ! পঁচিশ, তিরিশ, পঞ্চাশ হাজার মাইল দূরে কী আছে অপূর্ব সে-ঐশ্বর্য যা আমাকে নতুন জগতে নিয়ে যাবে — যার মোহে আমি আমার এই সামনের পৃথিবীকে দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারি ? সেখানে কি নেই এ চাঁদ, আর সূর্য, আর তারা ? কূপমণ্ডুক আমি, স্বীকার করি। কিন্তু এ কূপের জল আমার আজও পান করা শেষ হয়নি ; আমার ছোটো পৃথিবীর ঐশ্বর্যই আমার আজো উপভোগ করা শেষ হোলো না — এর চেয়ে বেশি হলে কি আর থই পাবো ?

এই রকম সঙ্কীর্ণ হচ্ছে আমার মনোভাব। সে-ই কবে ছেলেবেলায় কাকে ভালো লেগেছিল, বছর কুড়ি ধরে তাই নিয়েই কবিতা লেখা চলেছে। এখন পর্যন্ত বন্ধুরা এ অভিযোগ করেন নি — যে নানা জাতের নানা ধাঁচের নানা মেজাজের দুশো পঞ্চাশটা মেয়ে না দেখে এতগুলো প্রেমের কবিতা লেখা উচিত হয়নি। যাঁরা গল্প-উপন্যাস লেখেন এবং যাঁদের উপন্যাসে নারী-চরিত্রের বৈচিত্র্যের কথা সর্বজনবিদিত, দাম্পত্য জীবনে তাঁরা একাগ্র নন এমন কথা কেউ বলে না। তবে আমি যদি আমার রাসবিহারী এভিনিউ-এর তিনতলায় বসেই ভ্রমণকাহিনী লিখি তাতেই বা এমন কী দোষ ! বাংলা দেশের পাঠকেরা তো আসলে ভ্রমণকাহিনী নামে উপন্যাসই চান।

কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ভ্রমণকাহিনী লিখবার জন্য কোনো প্রকাশকই আজ পর্যন্ত আমাকে ফরমায়েশ করেন নি। বিখ্যাত লেখক না হওয়ার ঐটেই ক্ষতিপূরণ।

সঙ্গীত ও বিনয়

যদিও বাংলাদেশই হচ্ছে বৈষ্ণবধর্মের লীলাভূমি আর বৈষ্ণব-বিনয়ই বিনয়ের পরাকাষ্ঠা, তবু বাঙালী যে স্বভাবতই অতি বিনয়ী জাতি এ বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কুল-লক্ষণের মধ্যে বিনয়ের স্থান উপরের দিকে বটে, কিন্তু বাঙালী যে কুলীন জাতি নয় একথা কে না জানে? কাজেই বাঙালী চরিত্রে বিনয়ের অভাব বিস্ময়কর নয়। 'হিং টিং ছট্'-এ যবন পণ্ডিতের যে গুরু-মারা চেলা সগর্বে দু'চার কথা বলবার জন্য অগ্রসর, সে সাধারণ বাঙালীর মোটামুটি নির্ভুল প্রতিনিধিত্বের দাবি করতে পারে। জাতি হিসেবে নিজের শ্রেষ্ঠত্বে বাঙালীর বিশ্বাস এতই ব্যাপক ও অটল যে একজন অশিক্ষিত বাঙালীও একজন বুদ্ধিমান শিক্ষিত অবাঙালীকে খোট্টা বা মেড়ো বলে' অনায়াসে অবজ্ঞা করে। বাঙালীর কাছে সংস্কৃতি মানেই বাংলা দেশের সংস্কৃতি, সাহিত্য অর্থই বাংলা সাহিত্য, এমন কি ফুটবল মানেই বাঙালীর খেলা। আত্ম-শ্রেষ্ঠত্বের গভীর প্রত্যয়ে সে এমনি মশগুল যে অন্য দেশ বা প্রদেশকে নিন্দে করার আগে সে-সব দেশ-প্রদেশের সম্বন্ধে সামান্য সাধারণ জ্ঞান আহরণ করাও সে প্রয়োজন মনে করে না।

ব্যক্তিগত জীবনেও বাঙালী সাধারণত বিনয়ের অবতার নয়—সত্যের খাতিরে একথা স্বীকার করাই সঙ্গত। রাস্তায়-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, অহরহ বাঙালীর অবিনয় এত সহজে চোখে পড়ে, যে সত্যি কথা বলতে কি, অনেক সময়ই সেটা যেন আর চোখেই

পড়ে না। নজরটা আমাদের এমনি বিকৃত হয়ে গেছে যে বিনয়ের আতিশয্যেই যেন আমরা কেমন মুশড়ে পড়ি।

চরিত্রগত এই দুর্বলতা, বিনয়ের বাড়াবাড়িতে বিব্রত হবার এই দুরপনেয় প্রবৃত্তি গোড়াতেই স্বীকার করে' নেওয়া ভালো। বিনয় জিনিসটা তো ভালোই। তবু, নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি; মনটা যখন হয়তো বেশ উৎফুল্ল, ভাগ্যের বিরুদ্ধে অধিকাংশ অভিযোগই যখন প্রায় ভুলে' যাওয়া গেছে — সেই দুর্লভ শুভ-মুহূর্তেও অহেতুক বিনয়ের ধাক্কায় অনেক সময় সহসা আমরা একেবারে ভূমিসাৎ হয়ে যাই; কোথায় হারিয়ে যায় সে লগ্ন, যাকে ধরে' রাখতে পারলে স্মৃতির সিন্দুকে জমিয়ে রাখবার মতো দামি জিনিস হতে পারতো।

সঙ্গীতের, বিশেষত নারীকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত-সুধার সঙ্গে বিনয়ের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথাই বলছি আর কি। বাঙালী মেয়েরা যে বেশ সুকণ্ঠী এ কথা কে অস্বীকার করবে? নেহাৎ বিয়ের দুর্লঙ্ঘ্য বেড়াটা অতিক্রম করবার জন্যই যাদেরকে অন্তত দু'খানা বাংলা গান মোটামুটি আয়ত্ত করতে হয় তাদের কথা ছেড়ে দিলেও বাংলাদেশে সুগায়িকার কোনোই অভাব নেই। কিন্তু তবুও, কোনো সর্বজনবিদিতা সঙ্গীত-পারদর্শিনীকে কোনো আসরে একখানা গান গাইতে অনুরোধ করে' আপনারা কি কখনো বিনা-বিনয়ে আপনাদের আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ হতে দেখেছেন? আপনারা কি শোনেন নি যে ঠিক সেই দিন, সেই মুহূর্তে তাঁর গলার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, কিংবা তাঁর সামান্য, তুচ্ছ, শোনবার অযোগ্য গান আপনারা আর কী শুনবেন, কেনই বা শুনবেন — সেই বিস্মিত প্রশ্ন? মনে করুন, কোনো সদাশয়, অতিথিবৎসল বন্ধুর বাড়িতে অনেকে

সমবেত হয়েছেন। আপনাদের দলে আছেন আড্ডা জমানো রসিক, গল্প বলিয়ে কথক এবং আছেন দু'একজন সর্ব্বজনপ্রশংসিতা গায়িকা। আড্ডা জমেছে, গল্পের স্রোত ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এসেছে এক মন্থরতার হ্রদে — যেখানে সকলের মনেই উল্লাসের কলধ্বনি একটা স্নিগ্ধ আনন্দের আমেজে স্তব্ধ হয়ে এসেছে। মনে করুন, জানালা দিয়ে এক টুকরো চাঁদের আলোও ঘরে এসে পড়েছে। এমন সময়, এমন মাহেন্দ্র সময়েও, যদি আপনারই অন্তরঙ্গ বান্ধবী সেই গায়িকাদের একজনকে একটা গান গাইতে আপনি অনুরোধ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ, রাত্রির পর যেমন প্রভাত, সুখের পর যেমন দুঃখ, জন্মের পর যেমন মৃত্যু, তেমনি অভ্রান্ত, অবধারিত, নিশ্চিতরূপে আপনাকে শুনতেই হবে, 'আমার গান আর কী শুনবে?' কিংবা 'আজকে আমার গলাটা ভালো নেই।' এ উক্তি ব্যবহারে ভোঁতা হয় না, পুনরুক্তিতে মলিন হয় না। এইরূপ বিনয় ও প্রতিবিনয়ের সুদীর্ঘ বিনিময়ের পর, প্রত্যেকের বিচ্ছিন্ন এবং সমবেত ভাবে অনুরোধ জ্ঞাপনের পালা শেষ হলে, গানটা হয়তো শেষ পর্যন্ত হয়। কিন্তু সুধাবর্ষণ শুরু হবার আগেই দেখা যায় হ্রদ শুকিয়ে সেখানে হয়ে গেছে প্রায় মরুভূমি, গান আর তেমন জমে না।

সঙ্গীতের সঙ্গে বিনয়ের এ অবিচ্ছেদ্য যোগ কী করে', কবে থেকে সৃষ্টি হয়েছে জানবার উপায় নেই, কিন্তু এখন এটা দাঁড়িয়ে গেছে একটা অলঙ্ঘ্য ব্যবহারিক রীতিতে। এমন কি সুকুমার রায় তাঁর হ য ব র ল-তে যে অপরূপ ন্যাড়াকে এঁকেছেন, সে যদিও সর্বদাই লোককে গান শোনাবার জন্যই ব্যগ্র, তবু প্রথমেই, অনুরুদ্ধ হবার আগে থেকেই সে বলে' নেয়, 'না ভাই, এখন আমায় গাইতে বোলো না। সত্যি বলছি, আজকে আমার গলা তেমন খুলবে না।'

অবশ্য হ্যাড়ার কথা আলাদা। তাছাড়া সে গায়িকা নয়, গায়ক। এইজন্যই বোধহয় বিনয় প্রকাশের স্থানকাল সে ঠিক রাখতে পারে নি। তবুও দেখা যাচ্ছে, যে কাউকে গান শোনাবার আগে একটু বিনয় প্রকাশ যে না করলেই নয় একথা হ্যাড়ারও অজানা নেই। তাই সে আগে থাকতেই সেই কর্তব্যটুকু সেরে রাখে, গানের আবশ্যিক ভূমিকাটুকু চটপট চুকিয়ে দেয়। অবশ্য, কেউ বলতে পারেন যে গান গাইতে অনুরোধ করা মাত্রই কি সব সময় গান গাওয়া যায়? সঙ্গীত একটা উঁচুদরের ললিতকলা। আর আর্ট জিনিসটা মুহূর্তের ফরমায়েশে সৃষ্টি হতে পারে না। একজন কবি কি বলবামাত্রই তক্ষুনি একটা কবিতা রচনা করতে পারেন? কবি তা পারেন না, মানি। কিন্তু কবি, সাহিত্যিক, চিত্রকর ও সঙ্গীতজ্ঞের সাধনার পথ এক নয়, সিদ্ধিও এক নয়। লেখকের যাঁরা সমজদার ও শ্রোতা, যাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁর সাধনা, তাঁরা আছেন বহু দেশ, বহু কাল জুড়ে। তাই তাঁকে এতটুকু কথা এতখানি ব্যঞ্জনায় ভরে দিতে হয়, নতুন নতুন উপলব্ধির সম্ভাবনায় তাঁর রচনাকে রাখতে হয় পরিপূর্ণ করে'। কেবল আজকের দিনের মুষ্টিমেয় পাঠকের মন জোগালে তাঁর চলে না, অসংখ্য দিনের অসংখ্য মানবের মনের কথা তাঁকে ভাবতে হয়। সিদ্ধি তাঁর অনিশ্চিত। যাঁরা এ-জীবনে যশ পেলেন না, তাঁরাও আশা হারান না। নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর অনাবিষ্কৃত সমানধর্মার কথা ভেবে এগিয়ে চলেন তাঁদের সাধনায়। যাঁরা প্রচুর যশ পেয়েছেন তাঁরাও অনাগত মানবের মনে তাঁদের রচনা কোনো স্থান পাবে কিনা এই সন্দেহে লিখতে চান আরো ভালো করে'। কাজেই লেখকের দায়িত্ব অনেক বেশি, সাফল্য অনিশ্চিত; লেখক যতোই নামজাদা হোন, মৃত্যুর

দিন পর্যন্ত সমস্ত লেখাকেই তিনি সাধনার সোপান বলে' জানেন। পাঠক তাঁর চোখের আড়ালে, কালের আড়ালে। তাই তাঁকে প্রত্যেকটি কথা ওজন করে' বসাতে হয়। লিখতে হয়, কাটতে হয়, আবার লিখতে হয়। সহস্রবার অদল বদল করেও তাঁর মন ভরে না, মনে হয় আরো বুঝি ভালো হতে পারতো। তাই তাঁকে নির্জনে লিখতে হয়. সময় নিয়ে লিখতে হয়। সমস্ত অনাগত কালের মানব যা পড়ে আনন্দ পাবার সম্ভাবনা, তার সৃষ্টিতে এক দিন কি এক মাস, এমন কি এক বছর কাটলেও দোষ হয় না। অধ্যাপক থেকে শুরু করে' ইস্কুলের ছেলে পর্যন্ত যা নিয়ে সোরগোল করতে পারে, তার মূলে নীরব তপস্যার প্রয়োজন আছে।

সঙ্গীতের বেলাতে কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই উলটো। সুগায়ক হাতে হাতে পান নগদ দাম। গানের আলাপের সূত্রপাতেই শুরু হয় বাহবা, শেষ হয় উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়। গায়কের সমজদার চোখের আড়ালে লুকিয়ে নেই। কালের আড়ালে সে গা ঢাকা দেয় নি। সে আছে সামনে বসে'। সঙ্গীত যিনি আয়ত্ত করেছেন তিনি জানেন শ্রোতাদের তিনি কী পরিবেশন করতে পারেন বা করতে যাচ্ছেন। অপর পক্ষে লেখা শেষ করবার আগের মুহূর্তেও লেখক ভালো করে' জানেন না কী তাঁর কলম থেকে বেরুলো। সম্মুখবর্তী শ্রোতাদের বাদ দিলে গায়কের গান গাওয়ার কোনো মানেই হয় না। কাজেই গায়ক গায়িকারা যদি অনুরোধে গান গাওয়াটা বিনয়ের বেড়া তুলে' বন্ধ করতে চান, তাহলে তাঁদের বিনা অনুরোধেই গান গাইতে অভ্যাস করা দরকার।

সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গীতের আরো একটা বড় তফাৎ এই যে লেখক যখন তাঁর সাহিত্য সাধনায় নেহাৎই কাঁচা থাকেন তখনও

যদি তিনি তাঁর সেই অপরিপক্ব রচনা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেন, তাতে জগতের কারুরই কোনো ক্ষতি নেই। লোকে পড়বে না এই পর্যন্ত। অর্থাৎ লেখকের সাধনার সমস্ত পর্যায়গুলিই পাঠকরূপী সমালোচকের কঠোর দৃষ্টির সামনে খোলা রয়েছে। কিন্তু সঙ্গীত তার সমজদারদের কাছে এসে পৌঁছয় একেবারে সর্বাঙ্গসুন্দর রূপে — তার সাধনার স্তরগুলির সঙ্গে শ্রোতাকে পরিচিত হতে হয় না। সঙ্গীতের যিনি শিক্ষানবিশ তাঁকে কেবল লোকচক্ষুর নয়, লোককর্ণের আড়ালেই বিদ্যাভ্যাস করতে হয়, অন্তত করা উচিত। একজন লেখক যদি সারা জীবন লিখে কিছুই তাঁর জীবৎকালে প্রকাশ না করেন তবু তাঁর লেখার যদি যথার্থ মূল্য থাকে তা হারাবে না, এবং চিরকালই তা লোকে উপভোগ করতে পারবে। কিন্তু সঙ্গীতবিদ্‌কে তাঁর যা কিছু কৃতিত্ব এ-জীবনেই দেখাতে হবে, যেটুকু আনন্দ দেবার এই জীবনের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যেই সেটুকু করতে হবে নিঃশেষে বিতরণ। গায়ক যদি তাঁর বিদ্যা সকলের উপভোগের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দিতে পরাঙ্মুখ হন, তবে তিনিই ঠকবেন। তাঁর সঙ্গীত তাঁরই সঙ্গে হারিয়ে যাবে।

তা ছাড়া ফরমায়েশের উত্তরে ললিতকলা পরিবেশনেই বা সঙ্কোচের কী হেতু থাকতে পারে? লেখক-শিল্পী-ভাস্কর সবাইকেই ফরমায়েশী জিনিস রচনা করতে হয়। নিজের নিজের বিদ্যার চরিত্রগত পার্থক্যের দরুন সবাই হয়তো সামনে বসে' তক্ষুনি অনুরোধ পালন করতে পারেন না, কিন্তু ললিতকলাবিৎ এরকম অল্পই আছেন যাঁকে কখনো ফরমায়েশী জিনিস রচনা করতে হয়নি। আর ফরমায়েশী হলেই যে সৃষ্টি নিকৃষ্ট হবে, ইতিহাস এ-কথার পক্ষেও সাক্ষ্য দেয় না। সেক্সপীয়র, কালিদাসের কাব্য-নাটকও তো এক হিসেবে ফরমায়েশী। রাফায়েলের

প্রাচীরচিত্রও কি ফরমায়েশী নয়? অথবা তাজমহলের শুভ্র লঘু অর্ধোড্ডীন রূপ! আজকালকার দিনে সম্পাদকসংখ্যা বৃদ্ধির অনিবার্য ফলে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক গল্প-উপন্যাস লেখকদের একটা নিরবচ্ছিন্ন তাগিদের উপর থাকতে হয়। কারো ফরমায়েশ প্রেমের গল্প, কারুর বা অ্যাড্‌ভেঞ্চার। এই তাগিদের ফলে লেখকদের কলমে যা বেরোয় তার সবই কি বাজে? সব রকম ললিতকলাই ফরমায়েশে বেশ বেরোয়, এবং সর্বদাই ফরমায়েশে সৃষ্ট হচ্ছে। অবশ্য প্রাচীনকালের কাব্যবিলাসী বদান্য রাজা-রাজড়ারা গত হয়েছেন পর কবিতায় ফরমায়েশে ঢিলে পড়েছে। এমনও হতে পারে যে আজকাল কবিদের কেউ পোঁছে না, কারুর ফরমায়েশ-মাফিক তাঁরা লেখেন না বলেই।

যাই হোক, এ বিষয়ে কোনোই মতদ্বৈধ থাকা উচিত নয় যে গান যদি গাইতেই হয়, তবে শ্রোতাদের অনুরোধেই গাওয়া উচিত। কেননা বিদগ্ধ শ্রোতা ভিন্ন গান হতে পারে না। এবং গান গাইতে অনুরুদ্ধ হলে গায়ক মোটামুটি নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে শ্রোতারা তাঁর গান শ্রদ্ধা-সহকারে শুনবে। সঙ্গীত এমনি একটি কলা যা পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিক অভিনন্দনের অপেক্ষা রাখে—

'একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে,
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে।'

শ্রদ্ধাবান, রসজ্ঞ শ্রোতার কাছ থেকে যদি গান গাইবার অনুরোধ আসে, তাহলে বুদ্ধিমান সঙ্গীতবিদের সে-সুযোগ কখনই ছাড়া উচিত নয়। কেননা এরকম ক্ষেত্রে তাঁর কলা প্রাপ্য মর্যাদা পাবে বলেই তিনি ধরে নিতে পারেন। সাহিত্য যেমন পড়বার, ছবি যেমন দেখবার, গান তেমনি শোনবারই জিনিস। শ্রবণের মধ্য দিয়েই তার উপভোগ।

কাজেই কাউকে সঙ্গীত-পারদর্শী জেনে যদি কেউ তাঁর কাছে গান শুনতে চায় তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না, বরঞ্চ তার রসপিপাসু প্রবৃত্তির তারিফই করতে হয়। অপরপক্ষে দক্ষ গায়ক রসিক শ্রোতাকে সামনে পেয়ে গান শোনাতে চাইবেন এটাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত, কারণ শোনানোতেই গানের সার্থকতা।

'তোমায় গান শোনাবো
তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখো।'

এ-জাগরণে বেদনাকে ছাপিয়ে ওঠে তৃপ্তির আনন্দ। 'আমার এ গান শুনবে তুমি যদি, শোনাই কখন বলো!' শোনাবার যদি সুযোগ না হয় সেটাই তো চরম দুর্ভাগ্য। রবীন্দ্রকাব্যে অসংখ্য ছত্রে ছড়িয়ে আছে গান শোনাবার জন্য ব্যাকুল বেদনা, গান শুনিয়ে অসহ আনন্দের কথা। এটাই স্বাভাবিক। কারণ ললিতকলার যিনি প্রকৃত সাধক — তিনি কবি বা শিল্পী যাই হোন না কেন — নিজের যা দেবার তা পরিবেশনেই তাঁর আনন্দ। সৃষ্টির আনন্দ ও তৃপ্তি অপরের মনে সঞ্চারিত করবার আর তো কোনো পথ নেই! কৃপণের ধনের মতো যতটুকু লুকিয়ে রাখবেন, ততটুকুই জানবেন হারিয়ে গেলো সার্থক শিল্পই সত্যিকারের সেই ধন যা 'যতোই করিবে দান, ততো যাবে বেড়ে।' একটা কবিতা বিশ্বমানবের হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দের স্পর্শ দেয়, — একটি গান স্মৃতির সৌরভের মতো সকলের মনে গভীর আনন্দের আবেশ নিয়ে জড়িয়ে থাকে। কাজেই গান শোনবার আগ্রহের চেয়ে গান শোনাবার আকাঙ্ক্ষা কম হবার কোনো সঙ্গত যুক্তি নেই।

সাহিত্যের সাক্ষ্যকে যদি আমল দেওয়া যায়, তবে বলা যেতে পারে যে বাংলা কথা-সাহিত্যের যেটা শ্রেষ্ঠাংশ তার মধ্যে গান

শোনাবার অনুরোধ প্রায় নেই বল্লেই হয়। তার কারণ, বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকেরাও সম্ভবত আমার মতোই বিশ্বাস করেন যে সঙ্গীত কবিতা ও বনিতার মতো স্বয়মাগতা হলেই সুখের হয়। রবীন্দ্রনাথের নাটক তো সঙ্গীতে এত সমৃদ্ধ, কিন্তু সেখানে প্রায় সর্বাদই গানকে দেখতে পাই স্বতঃ-উৎসারিত, নিজের আনন্দেই প্রকাশমান্। আজকালকার সিনেমা ও থিয়েটারের প্রযোজকরা সাহিত্যে কথায় কথায় গান গাইবার অনুরোধের অভাবকে নিঃসন্দেহ একটা দুর্ভাগ্য বলেই মনে করেন। এবং সে অভাব তাঁরা নিজেদের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির দ্বারা যথেষ্টই পরিপূরণ করেন।

অন্যান্য ললিতকলায় যেমন, সঙ্গীতেও তেমনি, খানিকটা প্রতিভা, খানিকটা যোগ্যতা নিয়েই হয়তো মানুষ জন্মগ্রহণ করে। চর্চা দ্বারাই তা প্রকৃত সৃষ্টির পর্যায়ে উঠতে পারে। সঙ্গীতের কঠোর সাধনায় যাঁরা অনেক দূর এগিয়ে গেছেন, তাঁদের সঙ্গীতের আমরা অনেকেই যোগ্য শ্রোতা নই, স্বীকার করি। উঁচুদরের সঙ্গীতের আসরে তাই আমরা অনেকেই মুখ বুজে থাকি। যদি কিছু ভালো লাগে, ভালো লাগে। যা কিছু ভালো না লাগে, বুঝতে না পারি, তার জন্য ভাগ্যকে ধিক্কার দিই না। মনে একটা সান্ত্বনা থাকে যে হয়তো ওস্তাদজীর রবীন্দ্রকাব্যের উপভোগ 'দুই বিঘা জমি'র চেয়ে বেশি অগ্রসর নয়। কিন্তু এটুকু শুধু নিজের মনের সান্ত্বনা। মনে মনে জানি ওঁর বিদ্যে বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই। তাই আমাদের মতো সঙ্গীতপ্রিয় কিন্তু সঙ্গীতের সূক্ষ্ম কারুকার্য হৃদয়ঙ্গম করতে অপারগ পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যদি তেমন উঁচুদরের দুর্বোধ্য স্তরের সঙ্গীতবিদ আবির্ভূত হন, তবে, আমরা স্বভাবতই তাঁকে গান গাইতে অনুরোধ করতে ইতস্তত করি, — এমনকি

গান শোনবার জন্য ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের অত্যন্ত ইচ্ছে হলেও সেটা আমরা সাধারণত প্রকাশ করতে সঙ্কুচিত হই। যদি বা কোনো দুঃসাহসী বন্ধু সেই আনাড়ির আসরেও পূর্ব্বোক্ত অতি-উঁচুদরের গায়ককে গান গাইতে অনুরোধ করেন, এবং তার জবাবে আমরা যদি শুনি গায়কের সবিনয় অক্ষমতার কথা, তাহলে আমাদের মর্মাহত হবার কোনো কারণ থাকে না। কারণ, ও-বিনয়কে আমরা তখন আমাদের প্রাপ্য ভৎ'সনা বলেই ধরে নিতে পারি। বাস্তবিক উঁচুদরের সঙ্গীতের আমরা কতটুকুই বা বুঝি?

কিন্তু যখন বন্ধুবান্ধবের আসরে বন্ধুবান্ধবকে গান গাইতে অনুরোধ করা হয়, তখন বোঝাবুঝির প্রশ্নের চেয়ে ভালো লাগার প্রশ্নটাই বড় হয়ে ওঠে। হতে পারে আপনি একজন ভালো গায়িকা। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের কলাকৌশল অনেকখানিই আপনার আয়ত্তে। তবু আপনি যদি সুকণ্ঠী হন, আর আপনার বিদ্যা যে কত গগনচুম্বী তা আমাদের সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করাবার জন্য যদি আপনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ না হন, তবে আমাদের কাছে আপনার মধুর সঙ্গীত পরিবেশন করতে দয়া করে কার্পণ্য করবেন না। আপনার বিদ্যার উপভোগ তো সাহিত্যের মতো সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়! সাহিত্যের রস পাবার জন্য প্রয়োজন খানিকটা শিক্ষার, খানিকটা মানসিক সংস্কৃতির। সঙ্গীতের সূক্ষ্ম কলাচাতুর্যের বেলাতেও হয়তো সে-কথা খাটে। কিন্তু সঙ্গীতের আরো একটা দিক আছে যেটা শুধুই মাধুর্যময়। একটা নিরক্ষর জেলেডিঙির মাঝিও গান গায় — এবং হয়তো ভালোই গায়। এবং তার একান্ত অশিক্ষিতা অর্ধসভ্যা প্রেয়সীও হয়তো তাই শুনেই মুগ্ধ হয়। সঙ্গীতের বিদ্যায় আমরাও হয়তো নিরক্ষর। তবু বিশ্বাস করুন, মাধুর্য আমাদেরও মুগ্ধ করে।

আপনার কণ্ঠের চারুচাতুর্যের মর্ম হয়তো আমরা সব বুঝতে পারবো না, কিন্তু বিস্মিত আনন্দে তারিফ করতে পারবো।

অতএব হে একান্ত বিনয়ী গায়িকাগণ, আড্ডায়-আসরে আমরা যদি আপনাদের দু'একখানা গান গাইতে অনুরোধ করি, তাহ'লে দয়া করে' আপনাদের সঙ্গীত-সুধারস থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না। বিনয়ের দুস্তর বারিধি পার না হয়েই যেন আমরা আপনাদের সঙ্গীতলোকে পৌঁছুতে পারি।

তর্ক ও তার্কিক

আমার অসংখ্য অক্ষমতার কথা ভেবে আমি নিজেই অনেক সময় অবাক হয়ে যাই। একটা লোকের পক্ষে যে কতগুলো বিষয়ে অনাড়ি হওয়া সম্ভব আমি তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু তবুও এ-নিয়ে মনে কোনোদিন গভীর কোনো আক্ষেপ অনুভব করেছি বলে' মনে পড়ে না। আমি কী পারি আর কী কী পারিনা এমনিতরো কাজের একটা তুলনামূলক তালিকা পর্যন্ত মনে মনে কখনো তৈরি করিনি। জীবন-সংগ্রামে আমি মহারথী, রথী এমনকি গজারোহী-অশ্বারোহীও নই — এ-সত্য অনেকদিন আগেই এমন সহজভাবে মেনে নিয়েছিলাম যে অক্ষমতার কোনো দুঃখকেই কাছে ঘেঁসবার সুযোগ দিইনি। কিন্তু তবু, এমন বেপরোয়া যে আমি, সেই আমিও আমার একটিমাত্র অক্ষমতার কথা ভেবে অনেক সময় দুঃখ অনুভব করি। আমার সেই অতুলনীয় অক্ষমতা এই যে আমি একেবারেই তর্ক করতে পারি না।

সত্যি কথা বলতে কী তর্ক-বিশারদ হওয়াটাকে আমি জীবনের একটা বড় কৃতিত্ব বলে' মানি না। কিন্তু তর্ক করতে পটু হতে হলে যে-ক'টি গুণ বা দোষ না থাকলেই চলে না, তার দু'একটির অভাবে আমি মাঝে মাঝে বড়ই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ি। যেমন তর্কচ্ছলে যে নির্লজ্জ আত্মপ্রশংসা করা চলে, সহজ সাধারণ আলাপের মধ্যে সেটা টেনে আনা শক্ত। আবার যাকে পছন্দ করিনা, অথচ ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলতেও পারিনা, তর্কপ্রসঙ্গে তাকে

প্রায় যা খুশি তাই বলা চলে। অন্তত তার্কিকদের তো তাই দেখি। এমনিতে চমৎকার লোক — অমায়িকতার অবতার বল্লেই চলে, কিন্তু তর্ক করতে শুরু করে' অত্যন্ত মাননীয় অবিসংবাদী বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও হয়তো প্রকারান্তরে মূর্খ বলে' বসলেন। অর্থাৎ যাকে যা না বলবার মানুষ তখনই শুধু তাকে তা বলতে পারে, হয় যখন সে অত্যন্ত চটে যায়, নতুবা যখন কোমর বেঁধে তর্ক করে। সকলেরই এ রকম দু'একজন লোক পরিচিত আছেন, — যাঁদের খেলাচ্ছলে দু'একটি ন্যায্য কথা বলতে পারলে বোধহয় কারোই দুঃখিত হবার কথা নয়; আর এই কারণেই আমি ওস্তাদ তার্কিক নই বলে' মাঝে মাঝে মনে একটু ক্ষোভ অনুভব করি।

যাঁরা সত্যিকারের কৃতী তার্কিক, মানে তর্ক করে' যাঁরা ক্লান্ত, হন না, বরঞ্চ প্রতিপক্ষকে তর্কে ক্লান্ত, পরাজিত, ভূমিসাৎ করে' বিজয় গর্বে বেরিয়ে আসতে পারেন — তাঁরা আলোচনাকে বাক্‌যুদ্ধ হিসেবেই গণ্য করেন। যে-কোনো আলোচনায় যোগদান করে' শেষ পর্যন্ত যাতে বিজয়ী হতে পারেন সেটাই হয় এঁদের একমাত্র লক্ষ্য। 'আমিই জিৎলাম' এই আত্মপ্রসাদটুকু মনে সম্পূর্ণ না এনে এঁরা কখনোই বাক্যবাণ সংবরণ করেন না। আলাপ আলোচনায় এঁদের ধনুর্ভঙ্গ পণ প্রতিপক্ষের 'বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ'। চার্চিল-রুজভেল্টীয় প্রতিজ্ঞার চেয়ে এ-প্রতিজ্ঞা কম আন্তরিক নয়। এবং এঁরা যখন তর্ক করেন তখন ইউরোপীয় মহাসমরের মতোই প্রায় তা' ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই জাতীয় লোকেরা প্রায় সর্বদাই তর্কে জেতেন। অন্তত 'আমিই জিৎলাম' এই অনুভূতির আনন্দ থেকে এঁরা প্রায় কখনোই বঞ্চিত হন না। তার কারণ এঁদের

'আমি জিৎবোই' এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। যতক্ষণ না প্রতিপক্ষ নাজেহাল হয়ে কিংবা ভদ্রতার খাতিরে থেমে যায় ততক্ষণ এঁরা কিছুতেই নিবৃত্ত হন না; এমনকি এ রকম দেখা গেছে যে একজন তার্কিকের বিরুদ্ধে সকলেই মত দিচ্ছে, কিন্তু সংখ্যায় বেশি হলেও সবাইকেই শেষ পর্যন্ত নীরব হতে হয়েছে এঁর ধারাবাহিক যুক্তির ক্লান্তিকর পারম্পর্যের মুখে।

জয়গৌরব সব সময়ই আনন্দের — তা সে যুদ্ধই হোক বা তর্কই হোক। মোহনবাগান আর মহামেডান স্পোর্টিং-এর জয়-পরাজয় নিয়ে সারা বাংলাদেশে কী কাণ্ডটাই না হয়! এবং লোকে যতই জেতে জেৎবার নেশা তাকে ততই পেয়ে বসে। নইলে ঝাঁসি হিরোজ-এর এমন পৃথিবীব্যাপী ভ্রমণ কেন? কেনই বা মহামেডান স্পোর্টিং-এর কাবুল যাওয়া। তার্কিকদেরও তাই। জিতে জিতে এঁদের আশ মেটে না, আরো জেৎবার জন্যে সামান্যতম সুযোগ পেলেই এঁরা তর্কে নেবে যান — মনে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, 'জিতবোই'। যে-সব বিষয়কে আমাদের মতো সাধারণ লোকেরা সর্ব্ববাদীসম্মত বলে' মনে করে, তার মধ্যে থেকেও কী করে' যে এঁরা বাদানুবাদের ফ্যাঁকড়া খুঁজে পান সেটাই আশ্চর্য। এবং তর্ক করতে এঁরা যে কী ভালোই বাসেন সে-ও একটা দেখবার জিনিস। এ রকম তার্কিক কোনো লোকের উপস্থিতিতে, যে-কোনো লোকের পক্ষে যে-কোনো আসরে যে-কোনো রকম মন্তব্য না করাই হচ্ছে সব চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। কিসের থেকে যে এঁরা তর্কের অবতারণা করবেন সেটা অনেক সময় আমরা ভাবতেই পারি না। হয়তো পাঁচজন লোক বসে' আছি, একটা খুব সহজ মন্তব্য করা গেলো, কিন্তু তক্ষুনি এলো এক প্রবল প্রতিবাদ, 'আপনি এ-রকম

বলছেন — কিন্তু আমার মনে হয় এটা ঠিক নয়। বরং আমার মতে এই রকম হওয়া উচিত।' যদি বলেন, 'সে কী মশাই, এরকম কী হতে পারে?' অমনি তার্কিকের চেহারা উজ্জল হয়ে উঠবে চোখে মুখে যেন এক প্রতিভার দীপ্তি দেখা দেবে। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর যুক্তির তূণের যে-সব তাক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ নিয়ে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন, তার কাছে সব্যসাচীর অক্ষয় তূণও সামান্য। কিন্তু আমার মতো সাবধানী যারা, তর্কযুদ্ধে জয়লাভের আশা আকাশের চাঁদ ধরার মতোই অসম্ভব বলে' যারা আগে থেকেই জেনে রেখেছে, তর্কযুদ্ধে পরাজিত হওয়াটাকে যারা জীবনের একটা বড় দুঃখ বলে মোটেই গণ্য করে না, এরকম লোকের সঙ্গে কথা বলে' তার্কিকের কোনো আনন্দ নেই। গুরুতর তর্কের সম্মুখীন হবার আগেই আমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করি, অস্ত্র নিক্ষেপের আগেই আমরা ভূমিসাৎ হই।

আগেকার দিনে রাজা-রাজড়ারা লড়াই জিনিসটা খুবই ভালোবাসতেন। সামান্য সুযোগ পেলেই নিজেরা তো লড়াইতে নেবে পড়তেনই, এমন কি যেখানেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তির রোমাঞ্চকর সম্ভাবনা, সেখানেই তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা দেখো যেতো অকৃপণ। লড়ায়ে জন্তু-জানোয়ার তাঁরা রীতিমতো আদর করে পুষতেন — আবার দু' একজন লড়ায়ে তার্কিক সভায় না থাকলে তাঁদের সভাই অলংকৃত হোতো না। দিগ্বিজয়ী তার্কিক সেকালে দিগ্বিজয়ী রাজার চেয়ে কম ভয়াবহ ছিলো না, এবং যে রাজার সভাপণ্ডিত তর্ক করতে যত ওস্তাদ হতেন, তাঁর সভার হোতো তত বেশি নাম ডাক। তর্কসভা বলে একটা সভার কথা প্রায়শই পড়া যায়। সে-সভায় তর্ক চলতো ঘূর্ণাবর্তের মতো অন্তহীন গভীরতায়।

মীমাংসা হোতো তখনই যখন অপেক্ষাকৃত দুর্বল পক্ষ ক্লান্ত হয়ে চুপ করে যেতো। এবং তর্কযুদ্ধে কোনো সভাপণ্ডিত জয়ী হলে তিনি রাজার কাছ থেকে যে পরিমাণ সমাদর ও পুরস্কার পেতেন এবং রাজ্যে যে রকম আনন্দ-উৎসবের ধুম পড়ে যেতো, তার কিছু কিছু বর্ণনাও কাব্য-কাহিনীতে মেলে। তর্কের তখন এতই মান ছিলো যে, তর্কে যে হারাবে তার গলায়ই বরমাল্য দেবে, নামজাদা সুন্দরী রাজকন্যাদের এরকম ধনুর্ভঙ্গ পণের কথাও দু' একটি রূপকথায় শোনা গেছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের বণিক-রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো বনেদি অভিজাত সম্প্রদায় যখন ভেঙে গেল, তখন কাঁচা পয়সার জোরে নতুন যে অভিজাতদল গড়ে উঠলো, শিক্ষায়-দীক্ষায়, আচারে-ব্যবহারে বনেদি ঘরদের চেয়ে তারা যতই নিকৃষ্ট হোক, তর্ককে কিন্তু তারা ভুললো না। উঁচুদরের সাহিত্য এবং সূক্ষ্মস্তরের তর্কের রস উপভোগ করবার ক্ষমতা এদের ছিলো না, তাই এদের রুচিহীন আর্থিক প্রাচুর্যের পৃষ্ঠপোষকতায় মাথা তুললো লড়ায়ে কবির দল। এরা সব বিষয় নিয়েই গান গাইতো — আগমনী, কৃষ্ণলীলা, কিছুই প্রায় বাদ যেতো না। কিন্তু সে সব ছিলো গানের আলাপের মতো আসল জিনিসের ভূমিকা, প্রকৃত আকর্ষণটা ছিলো বাকযুদ্ধের। সে যুদ্ধে রুচি ও শালীনতা রক্ষার বাঁধাবাঁধি ছিলো না, লক্ষ্যটা ছিল হার-জিতের দিকে। যার বাক্যবাণ যত বেশি তীক্ষ্ণ হোতো, তার হোতো তত বেশি নাম ডাক। ঠাকুরসিং-এর —

'শোনোহে আণ্টুনি আমি একটি কথা জানতে চাই,
এসে এদেশে এবেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই?'

এই দু'লাইনে মিল ছাড়া কবিতার অন্য সব লক্ষণই অনুপস্থিত।

তবু এইরকম কথা শুনেই লোকে আনন্দ পেতো। এবং এর জবাবে আণ্টুনি ফিরিঙ্গি যখন বলতো

'এসে বাঙ্গালায় বাঙ্গালির বেশে আনন্দে আছি
হয়ে ঠাকুরে সিংয়ের বাপের জামাই কুর্তি টুপি ছেড়েছি।'

তখন লোকে ঠাকুর সিংয়ের বিপর্যয়ে যে পরিমাণ তারিফ করতো তার কাছে কোথায় লাগে এ-যুগের জয়ন্তী উৎসবের স্তুতিবাদ। 'নেইকো রামবোসের এখন সেকেলে পৌরোষ' এই জাতীয় জিনিসই লোকে শুনতে চাইতো, এবং উপভোগ করতো। সুতরাং কবির লড়াইতে সে-পক্ষেরই জিৎ হোতো যে-পক্ষ গালাগালি এবং গলাবাজি করতে পারতো যতো বেশি। সব তর্কেরই এই নিয়ম, সর্বযুগেই তাই। তখনও সেই কবিই জিততো যে বেশি বকতে পারতো এবং বেশি নির্লজ্জ হতে পারতো। এখনও তাই, শুধু রুচিটা একটু মার্জিত হয়েছে। আজকাল গালাগালিগুলো বক্র হয়ে বেরোয় ব্যাজস্তুতির মতো। তীক্ষ্ণ বাক্যের উপর ভদ্রতার পালিশ দিয়ে আজকাল তাকে তীক্ষ্ণতর করা হয় মাত্র।

আমাদের এই তর্কপ্রিয়তা ইংরেজ প্রথম থেকেই আঁচ করেছিল। এরা নিজেরাও তর্কপ্রিয় জাতি, তবে বণিকবুদ্ধির প্রাচুর্যে তর্কটাই এদের জাতীয় জীবনে প্রধান হয়ে উঠতে পারে নি। তবু ডিবেটর হওয়াকে ইংরেজ গৌরবের মনে করে। আর, আমাদের এই এত বড দেশটাকে তো এরা শুধু তর্কের টিকিতে বেঁধেই দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। আমরা যতই স্বাধীনতা-আন্দোলন করিনা কেন, শেষ পর্যন্ত আমাদের ভাগ্যে জুটেছে আরো বেশি করে, আরো ভালো করে, অনেকক্ষণ ধরে তর্ক করবার সুযোগ। কাউন্সিল, এসেম্বলি, আবার কাউন্সিল — তর্কের আর শেষ নেই। শেষ পর্যন্ত যখন হয়তো দেখা-

গেলো যে আমরাই (আমরা যে দলেই থাকি না কেন) তর্কে জিতেছি, তখন আনন্দের আতিশয্যে হয়তো লক্ষ্য করতেই ভুলে গেলাম, যে যেখান থেকে তর্ক শুরু হয়েছিলো কার্যত আমরা সেখানে থেকে বেশিদূর অগ্রসর হইনি। কিন্তু তবু সময় কাটাবার এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করে সন্তুষ্ট থাকবার একটা অস্ত্র ইংরেজ আমাদের দিয়ে গিয়েছে। তর্ক করে মাঝে মাঝে যেটুকু জয়গৌরব অনুভব করি, তাই ভাঙিয়েই আমাদের দিন চলে।

কাউন্সিল, অ্যাসেম্বলির তার্কিক বীরদের অক্লান্ত বাকযুদ্ধকে রবীন্দ্রনাথও সম্ভবত সমীহ করতেন; তাঁর চা-চক্রে তিনি এই সব কৃতী পুরুষদেরও নিমন্ত্রণ করে গেছেন —

'এসো কনষ্টিট্যুশন
নিয়ম বিভূষণ
তর্কে অপরিশ্রান্ত —' (এঁরা জয়ী)
'এসো কমিটি পলাতক
বিধান ঘাতক
এসো দিক্‌ভ্রান্ত টলমল হে।' (এঁরা পরাজিত)

কেবল অ্যাসেম্বলি নয়, ইংরেজদের বিচার, এবং তারই জের টেনে আজকের স্বাধীন ভারতের বিচারটাও চলেছে তর্কযুদ্ধের উপর। ইংরেজী কানুনে তর্কে যে জয়ী আইনেও সে জয়ী; সেকেলে কাজীদের বিচারের সঙ্গে ইংরেজদের আদালতের এই হচ্ছে আসল তফাৎ। কাজীদের বিচারের পদ্ধতিটা ছিলো যা-খুশি তাই, লক্ষ্য ছিলো ন্যায় বিচার। একালে বিচারালয়ে ন্যায়-অন্যায়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বিচারক যদি স্পষ্টত বুঝতেও পরেন যে ন্যায়ত-ধর্মত জিনিসটা রামেরই প্রাপ্য, তবু শ্যামের উকিল তর্কে বেশি পটু

শুদ্ধমাত্র এই কারণেই জিনিষটা এঁরা শ্যামকে দিতে ইতস্তত করেন না। একটা লোক খুনী মনে মনে একথা নিঃসন্দেহে জেনেও তর্কের ওস্তাদিতে তাকে সন্দেহের অবকাশ দিতে হয়। তর্ক ও তার্কিকের আজকাল এমনি মহিমা।

আমরা, যারা নেহাৎই সাধারণ লোক, তার্কিকের সম্মানে যাদের বিন্দুমাত্রও অধিকার নেই, বন্ধু-বান্ধবদের আসরে আমরাও যে কখনো তর্ক না করি তা নয়। কিন্তু তাকে তর্ক বললে তর্ক কথাটারই অপমান করা হয়। আমরা বাদানুবাদ করি, গলাবাজি করি, এমন কি বন্ধু-বান্ধবের প্রতি দু'একটা বাক্যবাণও হয়তো নিক্ষেপ করি, কিন্তু সে-বাদানুবাদ চলে গড়িয়ে গড়িয়ে নদীর স্রোতের মতো। কোথাও সে দাঁড়ায় না। রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' আগাগোড়াই বাদ-প্রতিবাদে ঠাসা, কিন্তু কথার সে স্রোতস্বতীকে বহুকাল চালিয়ে নেওয়া চলে দেশ থেকে দেশান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। আমরা যদি তর্ক শুরু করি প্রেমের কবিতা নিয়ে শেষ করবার সময় দেখি ভূতের গল্পে গিয়ে ঠেকেছি। কিন্তু যা আসল, খাঁটি, আদি ও অকৃত্রিম তর্ক তা চলে এক বৃত্তের পথ ধরে, নিজের গণ্ডি সে কোনো মতেই ছাড়ায় না। 'পাত্রাধার কি তৈল কিম্বা তৈলাধার কি পাত্র' এই হচ্ছে তর্কের খাঁটি আদর্শ। বীজ আগে না গাছ আগে — এই হচ্ছে আদি ও অকৃত্রিম তর্ক। কেননা এ-তর্কের আর শেষ নাই। এবং যতই শেষ হয় না, ততই কৃতী তার্কিকের গলা চড়ে। শেষ পর্যন্ত কণ্ঠের তীক্ষ্ণতায় ও ধৈর্যের উৎকর্ষে একজন জয়ী হয়ে বেরিয়ে আসেন — নয়তো দু'পক্ষই এই আনন্দ নিয়ে ক্ষান্ত হন যে আমিই জিতলাম।

এঁরাই হচ্ছেন খাঁটি তার্কিক, এঁরাই নমস্য।

দেশলাই

প্রমিথিয়ুসের অত কষ্টে আনা আগুন এলো আমাদের পকেটে পকেটে — হৃতগৌরবের লজ্জায় কালো মুখোস এঁটে।

আদিম মানবের কাছে অগ্নি ছিলো দেবতা, — এমন কি দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সূর্য-চন্দ্র-আকাশ, প্রকৃতির আর যে-সব প্রাণদায়ক মঙ্গলময় রূপ সে প্রত্যক্ষ করতো তাদেরও সে দেবপর্যায়ে তুলেছিলো বটে, কিন্তু অগ্নির কাছে ছিলো সকলেই তুচ্ছ। কেন না এমন প্রচণ্ড, প্রত্যক্ষ, সর্বগ্রাসী শক্তি আর কার? সূর্য-চন্দ্র, আকাশ-বাতাস, মেঘ ও সমুদ্রের রূপ ও গুণ উপভোগ ও অনুভব করবার জন্য হয়তো খানিকটা ভাবপ্রবণতা, খানিকটা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। কিন্তু আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, গুহামুখে আগুন জ্বেলে রাখলে হিংস্র-শ্বাপদের ভয় থাকে না, অগ্নিতে দগ্ধ করলে মাংস সুস্বাদু হয়, এসব কথা নির্বোধতম আদিম মানবেরও স্বল্পতম কালের মধ্যে বুঝে নিতে কষ্ট হয়নি।

এমন প্রচণ্ড শক্তি যাঁর, মানবের এমন হিতকারী বন্ধু যিনি, তিনি শক্তিমান্ কল্যাণময় দেবতা ছাড়া আর কি হতে পারেন? অগ্নি দেবাদিদেব, তাঁর পূজা তাই সর্বাগ্রে, ঋগ্বেদ তাই সেই পুরোহিত অগ্নির স্তোত্র দিয়ে শুরু। সব কাজের প্রারম্ভে তাই যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি — অগ্নিদেবকে খাদ্যে, পূজায় তুষ্ট করা।

মানুষ যখন প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মহিমা থেকে ঈশ্বরকে আলাদা করে নিলে, সেদিনও কিন্তু আগুনের প্রতি তার সভয় শ্রদ্ধা ও

সমাদর বিন্দুমাত্র কমেনি। বরং সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আগুনের প্রয়োজন গেছে বেড়ে। মানুষ শিখেছে, কেবল পশুমাংস নয়, শস্যাদিও কি করে অগ্নিতে সুপক্ক, সুস্বাদু করে নিতে হয়। অগ্নি যে কেবল দহনই করে না, আলোও দেয়, এ-ও তার অপেক্ষাকৃত নতুন শিক্ষা। আগুনের একটি শিখাকে তাই সে বেঁধে রাখল প্রদীপে। ঘরের অন্ধকারের চিহ্ন শুধু পড়ে থাকলো কম্পমান ছায়ায় ছায়ায়। তার পর সে বন্দী অগ্নিশিখাটি ছড়িয়ে পড়লো পথে, হাটে, মাঠে, ঘাটে। প্রচণ্ড, ভয়াবহ, লোলজিহ্ব, বুভুক্ষু বহ্নিদেবকে মানুষ দিলে খণ্ড খণ্ড করে — তার সাংসারিক, সামাজিক প্রয়োজনে। আগুনের বিভীষিকা সে প্রায় ভুলেই গেলো। এমন কি যে-কল্যাণ সে আগুনের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত আদায় করে নিতে লাগলো, তার মর্যাদা দিতে পর্যন্ত তার মনে থাকলো না। কেন না আগুনকে সে আজ বেঁধেছে। যে-দেবতার কাছে একদিন সে নতমস্তকে বর ভিক্ষা করেছিলো, আজ তাকে সে করতে শিখলো অবহেলা।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। যে-বহ্নি ছিলো শুধু মানুষের গৃহে ও সমাজে বন্দী, মানুষের চক্রান্তে সে দু'ইঞ্চি বাক্সে বন্ধ হয়ে এলো পকেটে। যার বিশাল দেহ ছোট একটু শিখার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নিজেকে বিস্তৃত করবার জন্যে ছটফট্ করতো, তার সেই কম্পমান শিখাটিকেও মানুষ বারুদের কালো মুখোস এঁটে দিলে অবরুদ্ধ করে। একটা দেশলাইয়ের কাঠির ডগা দেখে কে বলবে এটা আগুন? আলাদীনের দৈত্য কি এর চেয়েও আশ্চর্যের?

সেই ঋগ্বেদের দেবতা, সেই আলাদীনের দৈত্যকে আমরা পকেটে পকেটে নিয়ে ঘুরছি। যদিও জানি না কিংবা ভুলে থাকি কী প্রচণ্ড শক্তি আমার পকেটে, তবু দেশলাইটা পকেটে না থাকলে

নিজেকে যেন বড় অসহায়, বড় দুর্বল মনে হয়। কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। আগের মুহূর্তেই একটি সিগারেট নিঃশেষ করে' থাকলেও তক্ষুনি একটা সিগারেট জ্বালাবার স্পৃহা দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। নিজের অজ্ঞাতে হাতটা বার-বার পকেটে চলে যায়, খুঁজে বেড়ায় সেই পোষা দৈত্যটাকে যার স্ফুলিঙ্গ থেকে ইচ্ছে করলেই একটা খাণ্ডব-দহন করে দিতে পারা যায়। এমন আজ্ঞাবাহী, এত প্রচণ্ড শক্তি আমাদের মতো সামান্য সাধারণ মানুষের আয়ত্তে — ভাবতে অদ্ভুত লাগে। মনে হয়, অবচেতন মনে এ-বোধটা বোধ হয় আজও আছে।

নিজের কথা বলি; দেশলাই ছাড়া আমি হৃতগাণ্ডীব অর্জুনের মতো ম্রিয়মাণ। আমার পকেটে দেশলাই নেই এ কথা জেনে নিজে যতখানি পীড়িত বোধ করি, অপরের কাছে এ কথা স্বীকার করতে — অপরকে এ কথা জানাতেও আমার লজ্জা তার চেয়ে কম নয়। বালিগঞ্জ থেকে ডালহৌসি যেতে ট্রামে উঠে যখন দেখি পকেটে সিগারেটের প্যাকেটটা নিঃসঙ্গ পড়ে আছে, তখন দু'-দু'বার লোকের কাছ থেকে দেশলাই চাইতে হবে ভেবে মন খারাপ হয়ে যায়। কেন না আমি যে আজ শক্তিহীন দেশলাই চাওয়া তো তারই স্বীকারোক্তি। কেবল তাই নয়, আমি যে-শক্তির থেকে বিচ্ছিন্ন আর এক জন সে-শক্তির অধিকারে গৌরবান্বিত, এ কথা ভাবতে কি ভালো লাগে? জানি, যা চেয়ে নিচ্ছি আধুনিক সভ্যতার মাপকাঠিতে তার দাম কিছুই নয়। তিন পয়সার একটি দেশলাই — পঞ্চাশ-ষাটটি তাতে মুখোস-আঁটা অগ্নিবাণ। তার থেকে একটি কাঠি দরিদ্রও অকাতরে দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু শুধু পয়সায় কি সব জিনিসের দাম মাপা যায়? এই যে হেমন্তের সূর্যের আলো, এই যে চাঁদ, এই বাতাস আর নদী আর সমুদ্র আর পাহাড়

— আজও তো কেউ এদের কণ্ট্রোলের দাম বাঁধেনি। দেশলাইয়ের দাম যতই চড়ুক আজও আগুনের দাম অল্পই। পৃথিবীর যে-কটা সব চেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে শক্তিশালী, সব চেয়ে মহিমান্বিত জিনিস, হাটে-বাজারে তার দাম নেই। কিন্তু তাই বলে তো তাদের মর্যাদা দিতে ভুলতে পারি না।

পথে-ঘাটে এক শ্রেণীর লোক হরদম দেখা যায় যাঁরা অনেক দিনের পাকা কেরানি। এঁদের চিনতে কোন কষ্ট নেই। ট্রাম-বাসে কোনো রকমে একটু জায়গা অধিকার করে বসবার সঙ্গে সঙ্গে এঁদের চোখ দু'টি আসে বন্ধ হয়ে, মাথা পড়ে বুকের উপর ঝুঁকে অথবা পাশের যাত্রীর কাঁধের উপর। কিন্তু যতই ঘুমোন, কখনো এঁরা গন্তব্য স্থান পেরিয়ে যান না, এমন কি কোন মোড়ে এসে বিড়ি ধরাতে হবে তা পর্যন্ত খেয়াল রেখে নিদ্রাদেবীকে এঁদের কাছে আসতে হয়। পরশুরামের বিখ্যাত "তিনে কত্তি তিন" এর জাত এঁরা। বিড়িই এঁরা খান। কিন্তু এ-জাতের লোক খুব কমই দেখেছি যাঁরা পকেট থেকে বিড়ির সঙ্গে সঙ্গে দেশলাই বার করেন। বহু দিনের অভিজ্ঞতায় এ-সত্য ওঁদের ভালো করেই জানা আছে যে, যেখানেই তিন জন মানুষ আছে, সেখানেই অন্তত এক জনেরও পকেটে দেশলাই থাকতে বাধ্য! কাজেই বিড়ি ধরাবার জন্যে দেশলাইয়ের অভাব এঁদের কখনো হয় না — তা সে ট্রামে-বাসেই হোক কিম্বা রাস্তায়-ঘাটে-আফিসেই হোক। দেশলাই জিনিসটা চাইলেই লোকের কাছে পাওয়া যায়। আমার মতো দেশলাই-গর্বে গর্বিত যাঁরা তাঁরা খুশি হয়েই লোককে দেশলাই ধার দেন। তা'ছাড়া কলকাতার মতো জন-সমুদ্রে একই লোকের কাছে রোজ রোজ দেশলাই ধার করবার সম্ভাবনা কম। রোজই

এমন একটা ভাব দেখানো চলে যে দেশলাই আমার পকেটে রোজই সর্বদাই থাকে, শুধু আজই, জীবনে এই এক দিনই একবারই মাত্র অপরের একটি দেশলাই-কাঠি পোড়াতে হচ্ছে।

এই যে দেশলাই-বিহীন অগণিত বিড়িপায়ীর দল — এঁদের দেশলাইহীনতায় দোষ দেবার কিছুই নেই। একটা বিড়ির শেষ পর্যন্ত খেতে অন্তত তিনটে দেশলাই-কাঠি পোড়াতে হয়। দশ-বারোটা বিড়ি পোড়াতে আজকালকার দেশলাইয়ের বাক্স প্রায় ফাঁক হয়ে যায়। দেশলাইয়ের পয়সাগুলো বাঁচাতে পারলে আরো কিছু বিড়ি পকেটে আসে। এক্ষেত্রে এমন কোন মূর্খ আছে যে, বিড়ির পয়সা দেশলাইয়ে খরচ করবে? বিশেষত এ-শ্রেণীর লোক যে আগুনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উদাসীন তা আমরা পদে পদেই দেখতে পাচ্ছি! পাশের যাত্রীর কাছ থেকে দেশলাই ধার করে বিড়ির আগুনে তাঁরই ধুতি বা পাঞ্জাবি পুড়িয়ে এঁরা নির্বিকার থাকেন। চোখ বুজে অকুতোভয়ে বিড়ির আগুন ছড়াতে ছড়াতে এঁরা ট্রামে-বাসে চলেন। নিজেকে বাঁচিয়ে যতক্ষণ চলা যায়, ততক্ষণ আগুনের ক্ষমতার কথা এঁদের মনে কখনোই জাগে না। কাজেই দেশলাই পকেটে না থাকলেই বা এঁদের মনে দুঃখ কেন থাকবে?

আর এক জাতের লোক দেখেছি, দেশলাই যাঁদের প্রাণ, আমার চেয়েও যাঁরা দেশলাই-ভক্ত। দেশলাই সংগ্রহই এঁদের জীবনের ব্রত। এঁরা যে অভাবগ্রস্ত তা নয়। বরং অনেকেই সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন। কৃপণও এঁরা নন। আড্ডা দিতে বসে খুশিমনে এই দুর্দিনেও এক টিন সিগারেট বন্ধু-বান্ধবকে বিলিয়ে দিতে এঁরা কুণ্ঠিত নন। কিন্তু এঁদের সাহচর্য উপভোগ করার পর প্রায়ই দেখা যায়, বন্ধু-বান্ধবের দেশলাইগুলো সকলেরই অজ্ঞাতে যেন কোন

মন্ত্রবলে এই ভদ্রলোকদের পকেটস্থ হয়ে গেছে। অপরের দেশলাই সুযোগ পেলেই এঁরা পকেটস্থ করে থাকেন, এবং সেটা বহু দিনের অভ্যাসবশে অনেক সময় নিজেরও অজ্ঞাতসারে এমনি সুচারুরূপে করেন যে, এক-ঘর লোকের সজাগ চক্ষুও এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির পকেটান্তর লক্ষ্য করতে পারে না। আমি দিল্লিতে এক ভদ্রলোককে জানতাম — যিনি রাজ-সরকারে হাজারখানেক টাকা মাইনের বড় চাকরি করতেন। যুদ্ধের আগে এ-চাকরি নেহাৎ সামান্য ছিলো না। ভদ্রলোক ছিলেন প্রৌঢ়, গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত এবং অবিরাম ধূমপায়ী। বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিত কেউ এলে তৎক্ষণাৎ পকেটস্থ সিগারেট-কেস খুলে ধরতে তাঁর কার্পণ্য ছিলো না। কিন্তু দেশলাইটি নয়। সর্বদাই ইনি আগন্তুকের কাছ থেকে দেশলাই ধার করে সিগারেট ধরাতেন এবং সে-দেশলাই তার মালিক ফিরে পেতো কমই। ভদ্রলোকের এ দুর্বলতা এতই বেশি ছিলো যে, তাঁর বন্ধুদের দেখেছি তাঁর বাড়ি গিয়ে প্রায়শই দেশলাই-হীনতার ভাণ করতে।

আরেকটি ভদ্রলোক — আমাদেরই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু — সারা বিকেল আড্ডা দিয়ে যখন বাড়ি ফিরতেন তখন তাঁর পকেটে তিন-চারটে দেশলাই প্রায়ই পাওয়া যেত। আমরা ঠাট্টা করে বলতাম, এই রেটে দেশলাই জমালে ভবিষ্যতে শুধু দেশলাই বিক্রি করেই তিনি কলকাতায় বাড়ি করে ফেলবেন।

এই সব দেশলাই-ভক্তদের দেশলাই সংগ্রহের ব্যাপারটাকে চুরি বললে মহা অপরাধ হবে। এঁরা হচ্ছেন অগ্নিহোত্রীর জাত। পুরাকালে এঁরাই ছিলেন যজ্ঞাধিকারী। আলাদীনের দৈত্য এঁদের চিরদিনের ক্রীতদাস। আমার মতো বেকায়দায় এঁদের কখনোই

পড়তে হয় না।

এই রকম সব বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে অনেক রাত্রে মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরি। খাওয়া-দাওয়া সেরে গভীর রাত্রে সিগারেট জ্বালাতে গিয়ে দেখি দেশলাই আমার পকেটে নেই। যদিও বা কোনো রকমে উনুনের নিবন্ত আগুন থেকে সিগারেট ধরানো চলে, কিন্তু দারুণ ঘুম পেলেও দেশলাই-হীনতার কথা ভেবে কিছুতেই আর ঘুমোতে পারি না, বারংবার ধূমপানের স্পৃহা দুর্নিবার হয়ে ওঠে। সেই মধ্যরাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে পান-বিড়ির দোকান তখনও খোলা পাওয়া যায়। একটার জায়গায় দুটো দেশলাই সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরি — এখন যত ইচ্ছে সিগারেট খেতে পারবো এই সান্ত্বনা নিয়ে। কিন্তু শোবার ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই ধূমপানের স্পৃহা কোথায় চলে যায়। ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসে। আলো নিবিয়ে মুহূর্তে পরম নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ি। আমার অনুগত অদ্ভুতকর্মা বেতাল যে আমার শিয়রেই আছে, এই অনুভূতি মনে প্রগাঢ় শান্তি আনে। কাল ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই পাবো অগ্নির প্রাণদায়ী স্পর্শ, অগ্নিদেবের আশীর্বাদ।

ঘড়ি

অনাগুন্ত সময়কে গোলাকার গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখবার ভাণ করে, তুনিয়ার খবরদারির পরোয়ানা নিয়ে অধিষ্ঠিত হয়েছে ঘড়ি। এই মানব-নির্মিত উপকরণটি আজকে সভ্যতার ঘাড়ে চেপে বসেছে সিন্ধবাদের ঘাড়ের বুড়োর মতো। যাঁরা সভ্যতার আয়ুর্বেত্তা, তাঁরা ঘড়ির টিক্ টিক্ আওয়াজে সভ্যতার নাড়ীর স্পন্দন শুনতে পান। বস্তুত ঘড়ির শাসন যে দেশে যত প্রবল আজকের বিচারে সেই দেশই তত সভ্য, উন্নত ও জীবন্ত বলে গণ্য হবার স্পর্ধা রাখে।

ছোটোদের পড়ার সময় থেকে বড়দের মৌতাতের সময় পর্যন্ত ঘড়ি বলিষ্ঠ হাতে নির্দিষ্ট করে রেখেছে বলেই রক্ষে। নইলে ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে পাঠিয়ে বাড়ির গিন্নি এমন নিশ্চিন্ত হয়ে মোহন-সিরিজের বইখানা নিয়ে শুতে পারতেন কিনা সন্দেহ —কেননা, এমন নিশ্বাস-নিরোধী রোমাঞ্চকর কাহিনী একটানা শেষ না করলেই নয়। ভাগ্যিস ঘড়ির কাঁটায় মেপে চলে হাকিমি থেকে কেরানিগিরি, মাস্টারি থেকে মোসাহেবি, তাই রাষ্ট্রের যন্ত্রটি নিয়মিত চালে চলছে। জীবনের সুখ-দুঃখের চাকাটিকে ট্রামের লাইনের মতো বাঁধা রাস্তায় এনে ফেলা গেছে, যেখানে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কম। দুঃখগুলো হয়ে এসেছে ছোটো, আনন্দগুলি সংকীর্ণ। ছুটি পাওনা নেই এমন কেরানিকে সন্তানের শোক বেশিদিন বা বেশিক্ষণ মুহ্যমান করে রাখতে পারে না। আবার প্রথম শরতের সাদর সম্ভাষণ দশটা-পাঁচটার ভ্রূকুটির আড়ালে কোথায় যে লুকিয়ে পড়ে, তার

আর ঠিকানা মেলে না।

তবু ঘড়িকে আমরা সবাই মান্য করি, ভয় করে চলি। ঘুম থেকে উঠে যদি দেখা যায় ঘড়ির ছোটো কাঁটাটি আটটার কাছাকাছি এসেছে, তাহলে নিজের মনের কাছে বারংবার জবাবদিহি করতে হয়। আপিসে পৌঁছে যদি দেখা যায় ঘড়ির নিরপেক্ষ হাত দুটি সাড়ে ন'টার ঘর থেকে পৌনে দশটায় গিয়ে পৌঁছেছে তাহলে ধিক্কার রাখবার আর জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না। কাউকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করে' বারোটার মধ্যে আহার্য পরিবেশন করতে না পারাটা যথেষ্ট লজ্জার। এমনকি ছুটির দিনের আলস্য-যাপনের নেশায় মনে যখন রং ধরে আসছে, তখন বাড়িতে বসে এক পেয়ালা চা চাইলেও মনের নেশার প্রতিষেধক রূপে এইরূপ মন্তব্য শোনাই স্বাভাবিক — "এই বেলা বারোটায় চা খাবে !!"

অথচ মনের দরবারে বেলা বারোটার কোনোই মানে নেই। সেখানে অহরহ অলৌকিক ব্যাপার ঘটছে, যা ঘড়ির কাঁটার হিসেবে কোনোমতেই ব্যাখ্যা করা চলে না। বর্ষণ-মুখর শ্রাবণের অমাবস্যায় সেই মনোসভা সহসা ভাস্বর সূর্য্যালোকে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, আবার দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রে সেখানে কখনো কখনো নেমে আসে প্রায়ান্ধকার গোধূলি লগ্ন, যেখানে জীবনের সকল বুঝ-সমুঝ না-বোঝার ছায়ায় রহস্যময় হয়ে ওঠে। মনের ভিতরকার মানুষটি তো ঘড়ি দেখতে জানেনা, তাই শেখেনি সে নিয়মানুবর্তিতা, জানেনা নির্ভুল চালে চলতে। তাই সময়ের বর্তুলাকার প্রহরীর অনুশাসনে সময়টা যখন কাজের, তখন অকাজের ভূতটা তার ঘাড়ে চেপে বসে। ঘুমের সময়ে সে স্মৃতির সমুদ্রে অবগাহনের নেশায় মেতে জেগে থাকে, কখন ভোর হয়ে যায়

টেরও পায় না। সেইজন্যেই ছোটো ছেলেরা ইস্কুল পালিয়ে ঘুড়ি ধরতে যায়, আর কেরানিরা লেজারের নিচে রেখে লুকিয়ে উপন্যাস পড়বার চেষ্টা করে। অর্থাৎ কোন সময়ে কোন কাজটি করতে হবে, এ সম্বন্ধে ঘড়ির নির্দেশই যে মাননীয় একথা সভ্যজগৎ সমবেতভাবে মেনে নিলেও স্বতন্ত্রভাবে আমরা কেউই পুরোপুরি মানতে রাজি নই। কেননা ঘড়ি আমাদের অন্তর্লোকের শাসনকর্তা নয়। সে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। মানুষের মন ঘড়ির প্রজা হয়েই জন্মায়নি। ঘড়ি তাই তার জীবনে মান্য হয়েও অসহনীয়।

আজকের দিনের সভ্য, শিক্ষিত, সংস্কৃতিপরায়ণ মানুষের কাছে এই রকম মনে হতে পারে যে ঘড়ি না থাকলে আমরা কি করতাম! কি করে, কার নির্দেশে চলতো আমাদের কাজকর্ম, শোয়া-বসা, লেখা পড়া! কি করে হোতো সভা, কি করেই বা জানা যেতো রেডিয়োতে ঠিক কোন মুহূর্তে আমাদের প্রিয় গানগুলি গাওয়া হবে। সত্যিই আমরা কি করতাম! আজকের ব্যবহারিক জীবন যে কাঠামোয় আমরা গড়ে তুলেছি, তার ভিত গড়েছে ঘড়িরূপী খণ্ড খণ্ড, বহু-বিভক্ত, অথচ শৃঙ্খলিত সময়। ঘড়ি ছাড়া আমাদের কিছুতেই চলতে পারে না।

চলতে যে পারেনা এটাই দুর্ভাগ্য। এবং মনোময় ব্যক্তিত্বের আপত্তিও এইখানেই। লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, যে মানুষ যত বেশি আবেগপ্রবণ, ঠিক সেই পরিমাণেই সে সময়ের এই অস্বাভাবিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। মানুষ যুক্তিশীলতার অপ্রাকৃত কাঠামোর মাপে নিজের জীবনকে যতটা বাঁধতে সমর্থ, ঠিক সেই পরিমাণেই সে সভ্য ও উন্নত ব'লে গণ্য হয়, এবং ঠিক সেই অনুপাতেই সে ঘড়ির ভক্ত প্রজা। কিন্তু শিশুর মন ও

নারীর মন, অসভ্যের মন ও শিল্পীর মন হয়তো এখনো যুক্তির কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেনি, তাই মহাকালের অন্তরঙ্গ হয়েও তারা ঘড়ির বিরুদ্ধে চিরন্তন বিদ্রোহী। ঘড়ির কাঁটার মাপে জীবনের স্বাধীনতাকে টুকরো করে কাটতে তারা নারাজ।

এইজন্যই শিশুর সঙ্গে আমরা ভালো করে মিশতে আজ ক্রমশই ভুলে যাচ্ছি। কেননা তার কাছে সময়ের — অর্থাৎ ঘড়ির মাপে বাঁধা সময়ের কোনোই দাম নেই। গভীর রাত্রিকে শিশু তার কাকলীর অযোগ্য সময় বলে মনে করে না। অথবা রোজই যে নিয়মিত সময়ে তার পিতা বা মাতা তার সঙ্গ ত্যাগ করবে এটাও সহজে মেনে নিতে তার আপত্তি থেকেই যায়। সেইজন্যই বাবা আপিস যাবার সময় সে আপত্তি জানায়, মার রান্নাঘরে যাতায়াত সে পছন্দ করে না। শিশু-মনের সঙ্গে নেহাৎ ঘনিষ্ঠ না হলে এ-কথা বুঝতে কষ্ট হয় যে শিশু প্রকৃতই মনে প্রাণে ঘড়ির বিনাশ প্রার্থনা করে —

"যতো ঘণ্টা যতো মিনিট
সময় আছে যতো
শেষ যদি হয় চিরকালের মতো,
তখন স্কুলে না-ই বা গেলাম,
কেউ যদি কয় মন্দ
আমি বলবো—দশটা বাজাই বন্ধ,
তা-ধিন—তা-ধিন—তা-ধিন।
শুই না বলে বকিস্ যদি
আমি বল্‌বো তোরে
রাত না হলে রাত হবে কি করে?

দশটা বাজাই থামলো যখন
কেমন করে শুই
দেরি ব'লে নেইতো মা কিচ্ছুই।
তা-ধিন—তা-ধিন—তা-ধিন ॥

যুক্তির চেয়ে বেশি আবেগের অনুসারী ব'লে মেয়েদের মনটাও শিশুদের মতোই ঘড়ির নির্দেশ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর উদাসীন। সময় দিয়ে সময় রক্ষা না করার সম্বন্ধে মেয়েদের যে খ্যাতি সেটা পাশ্চাত্ত্য পর্যন্ত বিস্তৃত। দশটার সময় গাড়ি আসতে বলে কোন মেয়ে আর সাড়ে দশটার আগে প্রসাধনরতা হন? সিনেমায় আলো নিবে যাবার আগে যে-সব মহিলা আসন গ্রহণ করেন বুঝতে হবে তাঁদের স্বামীরা অসাধারণ কড়া মানুষ; নচেৎ এরূপ অঘটন ঘটতো না। কোনো জায়গায় বেড়াতে গিয়ে যথাসময়ে ফেরবার জন্যে তাড়া দিলে 'এইতো এলাম, এক্ষুণি ফিরতে হবে?' অপর পক্ষের থেকে এরূপ একটা বিস্মিত উক্তিই প্রত্যাশা করবেন।

বস্তুত মেয়েরা সময় মাপেন ঘড়ি দিয়ে নয়, ভালো-লাগা না লাগার মানদণ্ডে। এবং আমার মতে সেইরূপ হওয়াই সঙ্গত এবং প্রকৃতির অভিপ্রেত। ঘড়ির কাঁটায় যাই বলুক এ-সত্য কে না উপলব্ধি করেছেন যে আপিসে দশটা থেকে পাঁচটা যেন বারবারই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে সময় হচ্ছে অনাদি এবং অনন্ত; অপর পক্ষে রবিবারের আড্ডাটা ভালো করে জমতে না জমতেই দেখা যায় যে ঘড়ির মাপে অনেকখানি সময় পার হয়ে আসা গেছে। যৌবনের সে রোমাঞ্চকর দিনগুলি ঘড়ির মাপে নেহাৎ স্বল্পায়ু ছিলো না, কিন্তু ভাবতে গেলে মনে হয় যেন বড্ডই তাড়াতাড়ি সেগুলি শেষ হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ যে অশীতিবর্ষ অতিক্রম করেও আমাদের

মধ্যেই ছিলেন একথা মনে হয় না। মনে হয় তাঁকে যেন আমরা বড়ই অল্পক্ষণ পেলাম। প্রেমিক-প্রেমিকার গুঞ্জনে গোধূলি অজানিতে উষার রূপ ধরে দেখা দেয়। তার কারণ তাদের বক্তব্য ঘড়ির কাঁটায় মাপা যায় না, মহাকাল সেই দুর্লভ মুহূর্তটি লিপিবদ্ধ করে রাখবার জন্যে স্বয়ং খবরের কাগজের রিপোর্টারের মতো তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রকৃতই সময় দিয়ে জীবনের মূল্য যাচাই করবার মতো হাস্যকর আর কিছুই হতে পারে না। ঘড়ির মাপে যে সময়টার মূল্য হয়তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা, ওজন করলে দেখা যাবে হয়তো জীবনের বাদ বাকি ঘণ্টাগুলির চেয়ে সে বেশি ভারি। আবার চ্যাটারটন, কীট্‌স্‌ কিংবা রূপার্ট ব্রুক-এর জীবনের সঙ্গে আমাদের পেন্সন-প্রাপ্ত শতায়ু শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র পতিতুণ্ডি মহাশয়ের জীবনের তুলনা করতে যাওয়া হাস্যকর বাতুলতা, যদিও জানি ঘড়ির হিসেবে পতিতুণ্ডি মহাশয় বহুগুণ এগিয়ে গেছেন।

অযৌক্তিক কবিমনের সৌভাগ্য নিয়ে যাঁরা জন্মেছেন তাঁরা নিঃসন্দিগ্ধরূপে একথা জানেন যে সময় বলে যে একটা শাশ্বত পদার্থ আছে, ঘড়ির কাঁটায় তাকে ভাগ করা চলে না। কাক্কেশ্বর কুচকুচের ভাগের মতো সময়কে ঘড়ি দিয়ে ভাগ করতে গেলে, হাতে থাকে পেন্সিলের মতো অসহনীয় অসন্তোষ। কেননা কবির সবচেয়ে বড় পরিচয়ই এই যে সংসার-রূপ আদি ও অকৃত্রিম পেষণযন্ত্রের চাপেও তার মন নামক পদার্থটি পিষে যায় না। মনকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টাতেই কবির এতো দুর্ভোগ। এবং মনটাই যাদের প্রধান, ঘড়ির সঙ্গে কারবার চালানো তাদের পক্ষে সহজ নয়। কেননা, মনের লেনদেন প্রকৃতির সঙ্গে এবং ঘড়ির নির্দেশ সব সময়ই অপ্রাকৃত। মন চেনে উষা ও গোধূলি, দ্বিপ্রহর ও রাত্রি। লাইটিং আপ টাইম

সাতটা বলে যতই বড় করে লেখা থাক, আকাশের আলোর ধূসর ছায়াচ্ছন্নতাই মাত্র তার কাছে গোধূলির মায়া বহন করে আনতে পারে। সে গোধূলি ঘড়ি অনুযায়ী সাতটাতেও আসতে পারে, আবার বর্ষার মেঘে সে মোহকে টেনেও আনতে পারে বিকেল পাঁচটা কিংবা বেলা তিনটের সময়।

কোনোদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি পূব দিকের জানালা দিয়ে বিছানার উপর এসে পড়েছে ভোরের অনতিউষ্ণ রোদ, রংটা যার সোনার আর আহ্বানটা জাগরণের। কোনোদিন বা বর্ষার রিমঝিম শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। আবার কোনো সকালে উত্তাল হাওয়া বিছানার চাদর থেকে মাথার চুল পর্যন্ত এলোমেলো করে দিয়ে যায়। ঘুম ভেঙে মনে হয় মনটাও যেন সহসা তার খেই হারিয়ে ফেলেছে। অথচ ঘড়িতে হয়তো রোজই দেখা যাচ্ছে সকাল সাতটার ইঙ্গিত। কিন্তু ভেবে দেখুন — রোজই সময়টা কি একই? আবার দুপুর আর বিকেল আর সন্ধ্যা আর রাত্রি, তারই বা কত রূপ, কত বৈচিত্র্য! ঘড়ির একই প্রকোষ্ঠে দাঁড়িয়ে আমরা কত নতুন নতুন সময়ের আবিষ্কার করি। মহাকালের ভাণ্ডারে যত রত্ন আছে ঘড়ির বেড়াজালে তাকে কুড়িয়ে আনা যায় না। ঘড়ি অনুযায়ী একই সময় নিত্যই নতুন রূপ ধরে দেখা দেয়। এবং সময়ের এই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই আমরা বাঁচি, নতুবা পৃথিবীর অধিকাংশের মতো আমরা সবাই যন্ত্র-মানব হয়ে পড়তাম।

যদি ভেবে দেখা যায়, তা হলে সময়ই হচ্ছে একমাত্র জীবন্ত পদার্থ যাকে ঘড়ি দিয়ে বাঁধা যায় না। এমন কি বিজ্ঞানের সমস্ত পুঁজি উজাড় করেও মানুষ এমন কোনো অতি-ঘটিকা আবিষ্কার করতে পারেনি, যা দিয়ে সময়কে সে বাঁধতে পারে। সময় স্থাবর নয়,

জঙ্গম। নদীর স্রোতের চেয়েও অব্যাহত, সহজ তার গতি। তার উপরে বশ ভিন্ন অন্য কোনো বস্তু দিয়ে সাঁকো বাঁধা যায় না। বাঁধ গড়া চলে না সেই স্রোতে। সময়ের তুলনায় মানুষই হচ্ছে বরঞ্চ স্থাবর। পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেটুকু ঢেউ তটের কাছে এসে মিলিয়ে যায়, সেইটুকুই তার গতি — তার বেশি নয়। এইরূপ সংকীর্ণ, গণ্ডিবদ্ধ আয়তন বলেই তার উপর শাসন চলে। সেইজন্যেই আমরা আজ ঘড়ি মেনে চলতে ইতস্তত করি না। কেননা, জানি যে আয়ুর সীমানার মধ্যে ঘড়ির সাহায্যে যতটুকু ঘর গুছিয়ে চলতে পারি ততই লাভ। হয়তো জীবনটাকে এমনি করে খণ্ড, বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত করে নিলে 'চুরি চামারি করে' একটু সময় বাঁচানো চলে। হয়তো ভাবি, ঘড়ির কাঁটায় হিসেব করলে জীবনের অপরিবর্তনীয় সীমারেখাকে একটু বড় করে দেখে নিজেরি মনের কাছে সান্ত্বনা পাওয়া যাবে।

চিরপ্রবহমান সময়! আমাদের জীবনের শৈবালগুলি সেখানে কেমন করে জেগে, কবে কোথায় মিলিয়ে যায় কে তার সন্ধান রাখে? আমরা ঘড়ি দিয়ে হিসেব করি অতো হাজার কি অতো লক্ষ ঘণ্টা। বস্তুত মানুষের জীবনকে আমরা ঘড়ি দিয়ে যতই শৃঙ্খলিত করতে চাই না কেন, সর্বদাই সে শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে যেতে চায় পিঞ্জরমুক্ত পাখীর মতো। দু'এক জাতের পাখী থাকে যারা দাঁড়ে বসে থাকতেই ভালোবাসে। শিকলি কেটে দিলেও পালায় না। তাদেরই লোকে ভালোবাসে, আদর করে, পাখী পড়ায়, বলে — 'বলোতো ময়না রাধে কৃষ্ণ — চ্-উ-উ।' জীবনের সার্থকতার মাপকাঠিতে এরাই পাশমার্কা পেয়ে যায়। এরা সার্থক ব্যবসাদার অফিসার ও কেরানি।

কিন্তু জীবনে সার্থকতার ছাপ যারা পায়নি, নিয়মানুবর্তিতার পাঠশালের ছাত্রবৃত্তিতে যারা ফেল করেছে, তারা চেতনা বা

অবচেতনায় জানে যে সময়কে ও-ভাবে বাঁধতে যাওয়া হাস্যকর মূঢ়তা। নীরব, ভাষাহীন কাল তার নির্দেশ এমন করে অন্দাজী করে দিয়েছে আমাদের অন্তর্লোকের বাসিন্দার চলা ফেরার সঙ্গে, যে তাকে এড়িয়ে যাবার আর উপায় নেই। ঘড়ির শাসন যেন বৃটিশের অধীনে দেশীয় রাজার শাসন। আপাতদৃষ্টিতে যতই হুকুমদারি করুক উপরওয়ালার কড়ে আঙুলের নির্দেশে তাকে উঠতে বসতে হয়। সেইজন্যই সময়ের তরফ থেকে ভল্টেয়ারের উক্তি

"There's scarce a point whereon mankind agree
So well, as in their boast of killing me ;
I boast of nothing, but, when I've a mind,
I think I can be even with mankind."

সেইজন্যই কবির জগৎ ঘড়ির থেকে বিচ্ছিন্ন, সেইজন্যই কবিমনের কাছে ঘড়ির অস্বীকৃতি। বার বারই সে বলে, আমার যা সৃষ্টি তার বিচার হবে ঘড়িহীন কালের দরবারে, ঘড়ির সংকীর্ণ পরিপ্রেক্ষিতে নয়। বারবারই সে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে চায় যে কাল হচ্ছে নিরবধি। মহাকালের সঙ্গে যে-মন অন্তরঙ্গ, ঘড়িকে সে জানে অনধিকারী শাসনকর্তা বলে। সে-ই শুধু বলতে পারে—

"রাতের বেলা দুপুর যদি হয়,
দুপুর বেলা রাত হবে না কেন?"

ভূতের বিলোপ

বাংলাদেশের বনেদি ভূতেরা বিদেশী শিক্ষার অত্যাচারে ক্রমশ কাহিল হতে হতে এখন প্রায় লোপ পেতে বসেছে। তবু এতকাল, প্রত্যেক শহরে-গ্রামে, গঞ্জে ও বাজারে দু' চারখানা ভূতুড়ে বাড়িকে আশ্রয় করেই এরা কোনো রকমে টিকে ছিল। অবিশ্বাসের তাড়া খেয়ে একমাত্র ভূতের বাড়িতেই শেষ পর্যন্ত ছিল এদের নিরিবিলি আস্তানা। আধুনিক যুগে ভূতেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাউকে জ্বালাতন করেছে বলে বড় একটা শোনা যায়নি। নেহাৎ কেউ বাড়ি বয়ে গিয়ে এদের শান্তিভঙ্গ না করলে বাইরে বেরিয়ে কারুর উপর প্রতাপ ফলাবে, এ-জাতীয় প্রবৃত্তি বনেদি ভূতদের কোনোদিনই ছিল না, এমনকি ছিঁচকে ভূতেরা এবং ভূতগিন্নিরা, যারা আগেকার দিনে বেল, অশথ, বট গাছে ঘাপটি মেরে থেকে নিরীহ লোকদের ঘাড় মটকাতো কিংবা মাছ নিয়ে টানা-হেঁচড়া করতো, তারা পর্যন্ত হালের ইংরেজি আমলে কেমন মিইয়ে এসেছিল। তবু এতোকাল, এবারকার যুদ্ধের আগে অবধি, শ্মশানে-গোরস্থানে, শ্যাওড়া, বাবলা বেল, অশথ গাছে দু' একটা দুঃসাহসী ভূতের সন্ধান মিলতো। স্বচক্ষে দেখা না গেলেও এবং খবরের কাগজে 'বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ' হিসাবে ছাপা না হলেও, এই ভূতদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা সকলেই মোটামুটি ওয়াকিবহাল ছিলাম। কেননা যদিও আমাদের নিজেদের ঘাড় এখনো অক্ষত, তবুও আমাদের প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের দেশের

লোকের বিশেষ জানা-শোনা কারুর স্বকর্ণে শোনা অকাট্য প্রমাণের উপর নির্ভর ক'রে ভূতজাতির স্বভাব চরিত্র ও কার্যকলাপের বেশ একটি নির্ভুল ধারণা আমরা এতকাল মনে মনে পোষণ করে এসেছি। একান্ত পরিতাপের কথা যে এই ভূতজাতি, যাদের সঙ্গে যুগ-যুগান্ত ধরে এই পবিত্র ভারতভূমিতে আমরা বসবাস করে এসেছি, আজ ডোডো আর টেপিরের মতোই লোপ পেতে বসেছে। অন্ততঃ এদের শেষ আশ্রয় গাছ-গাছড়া আর পোড়ো বাড়ি থেকেও যে ভাবে এদের উৎখাত করা হচ্ছে, তাতে এরা যে এখন নিতান্ত নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে এ বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া উচিত।

এই কলকাতা শহরের কথাই ধরুন। আমার মনে পড়ে এই সেদিনও আমাদের বাড়ির কাছে একটা রাস্তা ছিল জনমানবহীন আস্তর উঠে যাওয়া একটা নিঃঝুম পাশ দিয়ে। সবাই বলতো ওটা ভূতের বাড়ি। বিশ্বাস করতাম বা নাই করতাম অনেক রাত্রে কখনো কখনো ওই বাড়িটার পাশ দিয়ে ফিরতে একটু গা ছম-ছম করতো। বেশ একটা ভুতুড়ে আমেজ লাগতো। ইদানিং দেখি সে বাড়িতে লোকজন, চেঁচামেচি, হুলুস্থূল কাণ্ড। যেখানে জনপ্রাণী যেতে সাহস পেত না, সেখানে এখন একাধিক মনুষ্য পরিবারের তাণ্ডব। আজ সেই ভুতুড়ে বাড়িতে তার ভূত নেই, আছে ভূতগ্রস্ত মানুষ। আর অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আগুনে যারা পোড় খেয়ে ঝামা হয়েছে, তাদের কাছে ভূতই বা কী আর অদ্ভুতই বা কী! কিছুই তাদের বিচলিত করতে পারে না। এরা যখন সেলামি কিংবা কন্ধকাটা কোন কিছুরই পরোয়া না ক'রে ভূতের বাড়িগুলোতেও চড়াও হতে আরম্ভ করেছে, তখন ভূতদের যাবার আর জায়গা কোথায়? শ্মশানও আজকাল

সরগরম, ম্যালেরিয়া আর দাঙ্গা, কলেরা ও চোরাই পিস্তলের কল্যাণে সেখানে এক সেকেণ্ড নিরিবিলি নেই। একমাত্র বনবাদাড়ে শ্যাওড়া আর বেল-বাবলা ছাড়া ভূতের রাজ্যের আজ সামান্যই মাত্র অবশিষ্ট আছে। তাও বোধহয় আর থাকে না। আশ্রয়-প্রার্থীদের চাহিদায় বন-জঙ্গল-জলার পাঁচ টাকা বিঘের জমি যে-রকম পাঁচ হাজার টাকায় বিকোতে শুরু করেছে, তাতে এই নিপীড়িত সর্বহারা ভূতজাতির জন্য রীতিমত দুঃখ হয়।

মানুষের মন যে কীরকম প্যাঁচোয়া বিরুদ্ধ-পথে চলে তার প্রমাণ, যে ভূত-প্রেত বিতাড়নের জন্যে আমরা একদা রোজা, রামনাম ও শর্ষের অকৃপণ প্রয়োগে কখনও পশ্চাৎপদ হইনি, এখন মনে হচ্ছে সেই ভূতদেরই অকাল-বিয়োগে আমাদের জীবন যেন অনেকটা মিইয়ে গেছে। সকলেই জানেন সর্বশক্তিমানের রাজ্যে কোনো কিছুরই বিনাশ নেই। পদার্থ মাত্রই 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়' এক রূপ ত্যাগ করে আরেক রূপ নেয় মাত্র। আমাদের জীবন ও জগৎ থেকে যে সহসা ভূতগোষ্ঠী একেবারেই লোপ পেল, এরা গেল কোথায়? কে জানে হয়তো আমাদের বুদ্ধি বা মস্তিষ্কের মধ্যেই এরা পুনর্ভূত হয়েছে।

আমাদের শহর, গ্রাম ও শ্মশান থেকে এবং আমাদের বিশ্বাস ও সমীহ থেকে এভাবে ভূতের ক্রমাপসরণের আমি তীব্র প্রতিবাদ করি। সমষ্টির মানসিক তুলা এবং ব্যষ্টির মানসিক উপভোগের জন্য এদের অস্তিত্ব — এমন কি এদের অদ্ভুত অলৌকিক কার্যকলাপ না থাকলেই চলতে পারে না বলে আমার বিশ্বাস। ভগবান ও ভূত থাকুক বা নাই থাকুক, আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে এদের প্রতি অচল ও অটুট আস্থা থাকা নিতান্তই দরকার। এবং

যেমন ভগবানে বিশ্বাসকে জীইয়ে রাখবার জন্য দরকার হয় মাঝে মাঝে মির‍্যাকল্, তেমনি ভূতে বিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য দরকার মাঝে মাঝে দুটো একটা কঙ্কাল ও করোটির ভয়াবহ আবির্ভাব। এতে বিচলিত হলে চলবে কেন?

ভূত কথাটির প্রাচীন অর্থে বিগলিত হওয়াতে আমরা যথেষ্ট গৌরব অনুভব করি। অতীত গৌরবের কথা ভাবতে ভাবতে আমরা মশ্‌গুল হয়ে যাই। কি জাতীয় জীবনে, কি ব্যক্তিগত জীবনে, অতীতের ভূতগ্রস্ত হয়ে নিশ্চল থাকতে আমাদের ভালোই লাগে। প্রপিতামহ অথবা তস্য প্রাপিতামহদের কিরূপ মান-সম্ভ্রম, অর্থ-প্রতিপত্তি ও দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল, সেকথা ভাবতে ভাবতে পঞ্চাশ টাকা মাইনের ধমক খাওয়া কেরানির জীবন স্বচ্ছন্দে সংসার-সিন্ধু পাড়ি দিয়ে যায়। অথচ বেশ একটি ভয় দেখানো, ঘাড়-মটকানো, সুস্থ ও সাধারণ ভূতের খবর পাওয়া মাত্র আমরা তেড়িয়া হয়ে উঠি। অতীতের ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে তৎক্ষণাৎ আধুনিক বিজ্ঞানের চোখা চোখা যুক্তিগুলো দিয়ে বেচারি ভূতকে বিপর্যস্ত করতে অগ্রসর হই। এটা কি ন্যায়সঙ্গত? আপনারাই বলুন।

যে কথা বলছিলাম। আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য ও উপভোগের জন্য ভূতের ভূতত্ব অক্ষুণ্ণ রাখাটা নেহাৎই দরকার। মানুষ তখনই ভূতে অবিশ্বাস করতে পারে, যখন সে অতিমাত্রায় সীরিয়াস্ হয়। জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে যখন সে যাচাই করে নেয় সাংসারিক বা জৈবিক প্রয়োজনের কষ্টিপাথরে। মানুষ যখন হৃদয়ের বিনিময়ে যুক্তির, কল্পনার বদলে বস্তুর, রসের বিনিময়ে তথ্যের সন্ধান করে' বেড়ায়, তখন তাকে দিয়ে রাষ্ট্রের কাজ চলতে পারে, কিন্তু দেশের কাজ চলতে পারে না। কেননা রাষ্ট্র বলতে আমরা বুঝি একটা

যন্ত্র, কিন্তু দেশ চলে রাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যুগ থেকে যুগান্তরে, রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রান্তরে। দেশ বলতে আমরা কেবল পুলিশ আর সৈন্য, ট্যাঙ্ক আর কামান বুঝি না, বুঝি তার শিল্প, তার ললিত কলা, তার সাহিত্য, তার হৃদয়, তার কল্পনা। আর একথা কে না জানে যে হৃদয় ও কল্পনা, সাহিত্য ও সুকুমার শিল্পের প্রথম ও প্রধান অবলম্বনই হল অলৌকিক। শৈশবের ঠাকুরমার ঝুলি ও প্রৌঢ়ত্বের গীতাঞ্জলিকে বাদ দিলে আমাদের জীবনের আর অবশিষ্ট থাকে কতোটুকু?

পরীকে বাদ দিলে যেমন রূপকথা হয় না, রাক্ষস-খোক্কস বাদ দিলে যেমন উপকথা হতে পারে না, দেব-দেবী ও দেবদূত-যমদূত না থাকলে যেমন লোকসাহিত্য হতে পারে না, তেমনি ভূত বাদ দিলে রসানুভূতির মূলটাই যায় শুকিয়ে। কেননা আলংকারিকেরা যে নবরসের উল্লেখ করেছেন, প্রেম ও ভয়ই তার আদ্যন্ত। আর সাহিত্য ও শিল্পের উদ্দেশ্য যেরূপ রস, সেরূপ রসের মূল হচ্ছে কল্পনা। ভূত হচ্ছে কল্পনার পটে আঁকা এক মৌলিক ছবি। সেই ছবিখানাকে সরিয়ে নিলে জীবনের আর্ট-গ্যালারিতে একটা অপূরণীয় ফাঁক দেখা দেবে, একথা সদ্‌যুক্তির অকাট্য সিদ্ধান্ত হতে বাধ্য।

আমাদের সাহিত্যের দিকে যদি দৃষ্টিপাত করি, তা হলে মানতেই হবে যে এতোকাল ভূতকে আমরা তার প্রাপ্য সম্মান থেকে কোনো দিনই বঞ্চিত করিনি। সকলেই জানেন আমাদের চতুর্বেদের মধ্যে অথর্ববেদ ইন্দ্রজাল, মন্ত্রতন্ত্র, টোট্‌কা-টাটকির আদিগ্রন্থ। এক কথায় তুকতাক বলতে আমরা যা বুঝি সেই ভূতুড়ে জিনিষ জুড়ে আছে অথর্ববেদের অনেকখানি। রামায়ণ মহাভারতে ভূতজাতির

প্রতি কোনো অবিশ্বাস নেই, যথেষ্ট সমীহ আছে। বৌদ্ধ সাহিত্যও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নয়। জাতকের কথা মনে করুন। ভূতগণ পার্থিব কার্যকলাপে রীতিমত জড়িত। ইল্লীস্-শ্রেষ্ঠীর পরলোকগত পিতার কার্যকলাপ কিরূপ রোমাঞ্চকর ব্যাপার ভেবে দেখুন।

কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের কথা বলে লাভ কী? ভূতজাতির সহায়তায় আধুনিক বাংলাসাহিত্যে আমরা যে সম্পদ লাভ করেছি, তাও কি তুচ্ছ? আর জীবনে যে রোমাঞ্চকর আনন্দ পেয়েছি সেও কি ভোলবার? ছোটবেলায় ভূতের গল্প শুনে মায়ের কোলে জড়িয়ে থাকা — সে কী পরম উপভোগ্য ভয়! আর বড় হয়ে সে কথা ভাবতেই বা কী আনন্দ!

'একটা দিকের দেয়ালেতে ছায়া কালো কালো।'

আর 'ভয় করতেই ভালোবাসি তোমার বুকে চেপে।'

এসব যদি জীবন থেকে বাদ যেত, তবে কি একটা মহৎ রসের স্বাদ থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম না? তবে কি আমাদের কল্পনার রাজ্যের একাংশ চিরকালের জন্য আমাদের অনধিগম্য হয়ে থাকত না? আমরা ছোটবেলায় ভূতপ্রেতের গল্পের বই পড়বার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হইনি। স্বীকার করি, নেহাতই সেকেলে সে সব ভূত। লম্বা লম্বা হাত পা, নাকিসুরে কথা কয়। লোককে ভয় দেখাতে ভালোবাসে, আবার রোজার তাড়া খেয়ে ভয় পেতেও বিলক্ষণ অভ্যস্ত। আজকাল আধুনিক শিক্ষিত অধিকাংশ বাপ-মাই হয়তো অপত্যগণের হাতে এইরূপ অবিশ্বাস্য অবৈজ্ঞানিক গল্পের বই দেবার কথা ভাবতেই পারবেন না। কিন্তু কেন? ভূতের অস্তিত্বের কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই বলে? কিন্তু পরীর অস্তিত্বেরও তো কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই; রাক্ষস-খোক্কসেরও না। ঈশ্বরকেও যে

প্রত্যক্ষ জানা যায় না, সেকথা কমলাকান্তের মারফৎ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই বলে গেছেন। যদি বলেন, শৈশব থেকেই ভূতের গল্প পড়তে বা শুনতে দিলে মানুষ ভীতু হয়ে যায়, তাহলে, বিবেচনা করলেই বুঝতে পারবেন যে, এর মতো ভ্রান্ত ধারণা আর নেই।

আমাদের দেশের গ্রাম্য লোক, যাদের আমরা অশিক্ষিত গেঁয়ো ভূত বলে অবজ্ঞা করি, তারা কেবল যে এই জাতীয় ভূতের গল্প শুনে অভ্যস্ত তা নয়, তারা এইসব গল্পের প্রত্যেকটি কথা বেদবাক্যের মতো বিশ্বাস করে। এমন কি বাংলাদেশের যে কোনো গ্রামে গিয়ে যে কোনো লোককে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে দিতে পারবে কোন বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য, কোন পোড়ো বাড়িতে শাঁকচুন্নি ও কোন শ্যাওড়া গাছে পেত্নীর বাস। কিন্তু দয়া করে এ-ও লক্ষ্য করবেন যে রাত্রের অন্ধকারে আলোহীন বুনো রাস্তায় সেই সব শ্যাওড়া, বেল, বাবলার পাশ দিয়েই তারা অকুতোভয়ে যাতায়াত করে, যা আপনি গোটা বিজ্ঞানটা কণ্ঠস্থ করেও পারবেন না।

একথা স্বীকার করতে আমি মোটেই লজ্জিত নই যে ভূতকে আমি যত ভয় করি, তার চেয়ে অসংখ্য গুণ বেশি ভয় করি কয়লা-ওয়ালা, কাপড়ওয়ালা ও তেলওয়ালাকে। কেন না এরা জীবনকে যেরূপ বিভীষিকাময় করে তুলতে পারে, কোনো ভূতেরই সাধ্য নেই সেরূপ করে। এদের সঙ্গে প্রতি পদে পদেই সংঘাত, কিন্তু ভূতের সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ নেই। বরং আমার মনের মধ্যে ভূতদের জন্য বিস্তৃত জায়গা করা আছে। যেরূপ এবং যত ভয়াবহ ভূতই আপনি নিয়ে আসুন না কেন, অসংকোচে সেখানে আমি তাকে ঠাঁই দিতে সর্বদাই প্রস্তুত। কেননা আমার বিশ্বাস ভূতের গল্পের শ্রবণ ও পঠন জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ বিলাস।

সাহিত্যের দিকে যদি দৃষ্টিপাত করেন তো স্মরণ করুন ইন্দ্রনাথকে, যে নৌকোর উপর অতি সন্নিকটে ভূতের অস্তিত্বে নিঃসন্দেহ হয়েও কত নির্ভীক! তারপর শ্রীকান্তের শ্মশান গমনের দৃশ্যটিও ভাবুন। প্রথম থেকেই ভূতের অস্তিত্বে বৈজ্ঞানিক সন্দেহ নিয়ে পড়লে এসব জায়গা কতটা উপভোগ করা যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ না করে পারি না। কেননা উপভোগের ভিত্তিটাই তো প্রত্যয়। প্রেম বলে' একটা জিনিসের অস্তিত্ব ও মাধুর্য স্বীকার না করলে প্রেমের কবিতা পড়ার কি কোনো মানে হয়? ভূতের সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করলে রবীন্দ্রনাথ 'মাষ্টারমশাই' ও 'ক্ষুধিতপাষাণে'র মতো বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্প সৃষ্টি করতে পারতেন, একথা বিশ্বাস করা শক্ত। এমন কি, ভূত তো দূরের কথা, ভূতে বিশ্বাসকে মাত্র অবলম্বন ক'রে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় 'রসময়ীর রসিকতা'র মত অনবদ্য গল্প সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। ভূতকে যদি মিথ্যা ও অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন, তাহলে মনে করুন 'হ্যামলেট', মনে করুন 'কঙ্কাবতী', মনে করুন 'ভুষণ্ডীর মাঠে'। ভূত হচ্ছে এই সব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ভিত। সেই ভিতই যদি উড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে অনেকখানি রসের উপভোগই আমাদের জীবন থেকে লোপ পেয়ে যাবে।

এটা আমার কাছে চিরকালই অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে যে, যে ইংরেজী শিক্ষার দোহাই পেড়ে আমরা ভূত সম্বন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত করি, সেই ইংরেজের সাহিত্যে ভূতের খাতির অত্যন্তই বেশি। এর দ্বারা বোঝা যায় যে ইংরেজের মনে এমন একটা জিনিসের প্রাচুর্য আছে, যেটা আমাদের নেই, কিংবা খুবই কম আছে। সেটা হচ্ছে ইংরেজিতে যাকে বলা হয় sense of humour। আমরা বাঙালিরা অতিমাত্রায় সীরিয়াস। সেইজন্য আমাদের ভাষায় sense of humour

এর একটা উপযুক্ত প্রতিশব্দ পর্যন্ত নেই। সেইজন্যই ওদের সাহিত্য অনেক বড়, অনেক সমৃদ্ধ। সেকস্‌পীয়র থেকে আরম্ভ করে অসংখ্য শক্তিশালী ইংরেজ সাহিত্যিক ভূতকে রসসৃষ্টির কাজে লাগিয়েছেন। ডিকেন্স ও অস্কার ওয়াইল্ড্‌, উইল্কি কলিন্‌স্‌ ও এইচ জি ওয়েলস, ওয়াল্টার স্কট এবং ওয়াল্টার ডি লা মেয়ার, কতো নাম করবো? এঁরা কেউ ভূতের গল্প লিখতে লজ্জিত হননি। এবং শুধুমাত্র ভূতের গল্প লিখে বিখ্যাত হয়েছেন, এমন সাহিত্যিকের সংখ্যাও ওদের দেশে নগণ্য নয়। ওদের দেশে বনেদি এবং ঐতিহাসিক ভূতদের নিয়ে রীতিমত গবেষণা হয়েছে — এবং ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন স্থানের ঐতিহাসিক ভূতদের সম্বন্ধে লিখিত বা প্রচলিত বিবরণকে ভিত্তি করে গল্প লিখে এম্‌ আর জেমস্‌ ইংরেজী গল্প-সাহিত্যে বেশ একটি আসন পর্যন্ত করে নিতে পেরেছেন। এম্‌ আর জেমস্‌ একটা কেউকেটা লোক নন। তিনি সুবিখ্যাত ইটন কলেজের প্রভোস্ট, বিদ্যানাগ্রগণ্য। অথচ সেই তুলনায় কত স্বল্পশিক্ষিত হয়ে ভূত সম্বন্ধে আমরা কত বেশি উন্নাসিক।

বাংলাদেশের লোক আজকাল ভূত সম্বন্ধে — অন্তত দিনের বেলায় — ঘোরতর অবিশ্বাসী। বাংলাদেশের লেখকেরা অধুনা ভূত সম্বন্ধে উদাসীন এবং ভূতের গল্প লিখতে অনিচ্ছুক। কিন্তু তার চেয়েও যেটা পীড়াদায়ক, বাংলাদেশের পাঠকেরাও ভূতের গল্পের প্রকৃত মর্যদা দিতে যেন পরাঙমুখ হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে ভালো ভূতের গল্প নেই — ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের রচনা পড়বার পর কারুই একথা বলা উচিত নয়। অবশ্য স্বীকার করি ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের ভূতেরা সূক্ষ্ম মনস্তাত্বিক ভূত নয় — বেশ সেকেলে, দুষ্টবুদ্ধি পরায়ণ, স্বাভাবিক সুস্থ ভূত। কিন্তু তাতে কী যায় আসে?

অমন উপাদেয় ভূতের গল্পও বাংলাদেশের পাঠকেরা পড়ে না, বরং ভুলে যেতে বসেছে। এমন কি ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম বাংলাদেশের শিক্ষিত পাঠকদের অধিকাংশের কাছে অবিদিত। 'কঙ্কাবতী'র কথা ছেড়ে দি, কেননা কেউ কেউ হয়ত ও বইখানা পড়ে থাকবেন। কিন্তু তাঁর লুল্লু, গোঁগা ও ঘ্যাঁঘো এখন বিস্মৃত। এর চেয়ে দুর্দৈব আর কী হতে পারে?

ভূতের এই ক্রম-বিলোপ সম্বন্ধে ত্রৈলোক্যনাথ নিজেও অবহিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছেন তা অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলছেন: 'ইংরেজের প্রভাবে আমাদের সকল ব্যবসাই একরূপ লোপ পাইয়াছে। অন্য ব্যবসার কথা দূরে থাকুক, ভূতদিগের ভূতে পাওয়া ব্যবসাটি পর্যন্ত লোপ হইয়া গিয়াছে। এই হতভাগা দেশের লোকগুলো এমনই ইংরেজি ভাবাপন্ন হইয়াছে যে কাহাকেও ভূতে পাইলে বা ডাইনে খাইলে বলে কিনা হিষ্টিরিয়া হইয়াছে। এ কথায় রক্তমাংসের শরীরেই রাগ হয়, ভূতদের ত রাগ হইবেই। তাই ঘৃণায় ভূতকুল একবাক্যে বলিল,— "দূর হউক আর কাহাকেও পাইব না"···ভারতের ভূতকুল ও ডাইনীকুল আজ তাই মৌনী ও ম্রিয়মান! শ্মশান মশান আজ তাই নীরব। রাত্রি দুই প্রহরের সময়, জনশূন্য মাঠের মাঝখানে, আকাশ পানে পা তুলিয়া জিহ্বা লক লক করিয়া, চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেকালে ডাইনীরা যে চাতর করিত, আজ আর সে চাতর নাই। মরি! মরি! ভারতের সকল গৌরবই একে একে লোপ হইল।'

ত্রৈলোক্যনাথ যাকে ইংরাজি ভাবাপন্নতা বলেছেন সেটা হচ্ছে আসলে নকল ইংরেজিয়ানা। ভারতচন্দ্র বলেছেন, 'প্রখর রবির তাপ শিরে সহ্য হয় হে, তার তাপে বালি তপ্ত কভু সহ্য নয় হে।'

ভূত সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব তারই উদাহরণ।

ভূতগণ যে বাংলাদেশে ভূত হিসেবে আর টিকতে পারবে না, একথা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ত্রৈলোক্যনাথ অনেকদিন আগেই সম্ভবত টের পেয়েছিলেন। সেইজন্য তার বিখ্যাত ভূত গোঁগাকে তিনি মর্ত্যধামেই যথোপযুক্ত কাজে লাগিয়ে দিয়ে গেছেন।—

'আমীর তহোকে বলিলেন,— গোঁগা।···একখানি খবরের কাগজ খুলিব, তাহার সম্পাদক হইবে তুমি।···যথাসময়ে আমীর একখানি সংবাদপত্র বাহির করিলেন। একে ভূত সম্পাদক, তাতে আবার চণ্ডুখোর ভূত,— গুলির চৌদ্দপুরুষ। সে সংবাদপত্রের সুখ্যাতি রাখিতে পৃথিবীতে আর স্থান রহিল না।

গোঁগা যে কেবল আপনার সংবাদপত্রটি লিখিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহা নহে। সকল সংবাদপত্রের অফিসেই তাঁহার অদৃশ্যভাবে যাতায়াত আছে।'

আশ্বাসের কথা এই যে, ত্রৈলোক্যনাথের উক্তি সত্য হলে গোঁগা প্রভৃতি ভূতগণ একেবারে লোপ পায়নি, আমাদের মধ্যেই অন্যরূপে বিরাজ করছে। এটা কথঞ্চিৎ সান্ত্বনার কথা হলেও আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে ভূতদের ভৌতিক কার্যকলাপই আমি পছন্দ করি, তাদের সাংবাদিক ও সাহিত্যিক তৎপরতা আমার পছন্দ নয়।

অতিবাদ

মানুষের একটা অনতিক্রম্য স্বভাব হচ্ছে, ধর্ম, রাষ্ট্র, নীতি ও রুচির শাসকেরা যে সব কাজকে নিন্দনীয় ও বর্জনীয় বলে ঘোষণা করেন, তারই প্রতি সে দুর্ণিবার আকর্ষণ অনুভব করে। অনেকের বিচারে এটা মনুষ্য সমাজের এক দুরপনেয় দুর্বলতা ও অক্ষয় কলঙ্ক। ব্যাপারটাকে একটু ঘুরিয়ে এরূপ ভাবেও দেখা যায় যে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোক যে সব জিনিস খুব বেশি উপভোগ করে, তার প্রতি আমাদের ধার্মিক, রাষ্ট্রিক ও নৈতিক শাসকদের একটু সন্দেহ ও বিরক্তি আছে — এবং মনে হয়, একটু ভয়ও যে না আছে এমন নয়।

বলা বাহুল্য, কর্তাব্যক্তিদের এ-সন্দেহ ও আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়। কেননা, যে-সব কাজ অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও যে-সব কথা অতিশয় মুখরোচক সে-সব কাজ ও কথাগুলিকে একটা নিষেধের গণ্ডির মধ্যে বন্দী করে না রাখতে পারলে পৃথিবীর অপ্রিয় অথচ জরুরি কাজগুলি যে কোনদিন হয়ে উঠবে, এ-আশা সুদূর-পরাহত। ধরুন, মিথ্যে কথা বলা ও পরচর্চা করার চেয়ে পরমানন্দের কাজ আর কী আছে? এই দুটি কাজ গর্হিত এইরূপ একটি ধারণা আমাদের মনে না থাকলে, কেউ যে এদের ছেড়ে অন্য কার্যে মন দিত এরূপ মনে হয় না। মিছে কথা বলার মধ্যে মানুষের যে একটা সহজাত দুর্ণিবার আকর্ষণ আছে, সেটা শিশুদের লক্ষ্য করলেই টের পাওয়া যায়। খেলা তাদের কাছে যত প্রিয় মিছে কথা বলাও তার চেয়ে কম প্রিয় নয়। সেই জন্যে অক্ষর পরিচয় হবার সঙ্গে

সঙ্গেই তাদের শিখিয়ে দেওয়া হয় 'মিথ্যা বলা বড় দোষ। কদাপি মিথ্যা কথা কহিবে না।'

মিথ্যা কথনের ফল যে অনেক সময় বিষময় ও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়, এ-বিষয়ে সংশয় করা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু সত্য কথনের ফলও যে কখনও কখনও সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াতে পারে তার প্রমাণ যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠার ফলে পাঞ্চালীর লাঞ্ছনা ও দুর্মুখের সত্য কথনের ফলে সীতার পাতাল প্রবেশ। ধাত্রী পান্না যদি 'সত্য ভিন্ন মিথ্যা কহিব না' এই প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত না হ'ত তবে ইতিহাসে ও পাঠ্য পুস্তকে তার সুখ্যাতি তো দূরের কথা, নামোল্লেখ পর্যন্ত থাকত কিনা গুরুতর সন্দেহের বিষয়। এবং গণ্যমান্য মনীষীরা চিরকাল সত্যে অবিচলিত থাকলে পৃথিবীতে রাজনীতি, অর্থনীতি, সংখ্যাতত্ত্বাদি নানাবিধ বিজ্ঞান মোটেই আবির্ভূত হ'ত কিনা তাও জোর করে বলা যায় না।

যাই হোক, সত্য-মিথ্যার তুলনামূলক বিচার আমার উদ্দেশ্য নয়। সত্য-কথনেরই জয় হোক চিরকাল। বাল্যকালের শিক্ষা আমার এবং আরো অনেকেরই এরূপ সুষ্ঠুরূপে পরিপাক হয়ে গেছে, যে আগে থেকে ভেবে চিন্তে ঠিক করে না রাখলে আমাদের পক্ষে মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করাই প্রায় অসম্ভব। আমি শুধু নিবেদন করতে চাই যে মিথ্যার যিনি রাজা, 'অতিশয়োক্তি' এই মোলায়েম নামে যিনি পৃথিবীতে পরিচিত, তিনি না থাকলে আমাদের জীবন নিতান্তই নীরস এবং একঘেয়ে হয়ে উঠতো।

সেকালে চণ্ডীমণ্ডপে হুঁকো টানতে টানতে প্রাচীন ও প্রাজ্ঞ গ্রাম্যবৃদ্ধেরা যে সব গল্প মারতেন ইদানিং বেশি বুদ্ধিমান হয়ে আমরা সেগুলোকে 'গুল,' 'ধাপ্পা,' 'গাঁজাখুরি' ইত্যাদি হীন ও অবজ্ঞেয়

নামে চিহ্নিত করেছি। আমার মনে পড়ে বাল্যকালে এক রসিক-সুজনের কাছে চাকা-ওয়ালা ফজলি আমের গল্প শুনেছিলাম। সেই অতুলনীয় আমটি যে চাকা নিয়েই বৃক্ষশাখায় আবির্ভূত হয়েছিল, এরূপ অবিশ্বাস্য মিথ্যাকথা এ-ভদ্রলোক আমাকে বলেন নি — একথা তাঁর স্মৃতির সম্মানার্থ আমি লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য। এঁর বক্তব্য ছিল যে তিনি নাকি কবে এক অদ্বিতীয় রসাল ফলের স্বাদ গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন, যেটির আয়তন ও ওজন ছিল এরূপ সুবিশাল যে তাকে যথাস্থানে আনয়ন করতে তার তলায় গুটি আষ্টেক চাকা সংযোগ করে দিতে হয়েছিল। এইরূপ একটি আম্রফল কোন শিশুর কল্পনাকে না আচ্ছন্ন করবে? এমন কোন বৃদ্ধ আছেন, যিনি মুখে যাই বলুন, ওই ধ্যানযোগ্য রসাল ফলের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস সহকারে মনে মনে না ভাববেন 'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব, তোমারি রসাল-নন্দনে?'

কালিদাস যে কথা-কোবিদ্ গ্রামবৃদ্ধগণের কথা বলেছেন আমার বাল্যকল্পনার এই অনুপ্রেরক ছিলেন তাঁদেরই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী, নমস্য ও স্মরণীয়। আর, যদি ভেবে দেখা যায়, আমাদের এবং সকল দেশেরই পুরাণ-ইতিহাসে এই অতি-কথনপটু বাক্‌কুশলীগণের দান বড় কম নয়। সেকালে সম্যপরাজিত অনার্য রাক্ষসেরা আর্যগণের ধর্মে-কর্মে, যাগযজ্ঞে বিস্তর বিঘ্ন ঘটাতো সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে তাড়কা ইত্যাদি রক্ষগণের যে বিশাল দেহ, বীভৎস আকৃতি, অলৌকিক ও বিপরীত কার্যকলাপের বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলিকে 'গুল্' ছাড়া আর কি বলবো? এই অতিশয়োক্তির মূল যদি খুঁজে দেখা যায়, তবে অবশ্যই কোনো না কোনো কল্পনাপ্রবণ আদি-মনীষীর সাক্ষাৎ মিলবে যিনি খেলাচ্ছলে এর সূত্রপাত করেছিলেন।

এইরূপ রামায়ণে হনুমানের একলম্ফে সমুদ্রলঙ্ঘন, মহাভারতে জরাসন্ধের কাহিনী ও ধৃতরাষ্ট্রের অযুত-হস্তীর শক্তিমত্তা, ব্রাহ্মণ ও পুরাণে দেব, দানব ও ঋষিগণের অদ্ভুত কার্যকলাপ নেহাৎই আমাদের চোখে দেখা জাগতিক সত্যের মত নয়। এই সব পুরাণ-ইতিহাস তৎকালীন জনসমাজে প্রচলিত কিংবদন্তী ও প্রচলিত কাহিনীর উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে মানতেই হবে যে 'গপ্প-মারা'র প্রতিযোগিতায় আমরা আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের উপর বড় বেশি টেক্কা দিতে পারিনি।

সত্যি কথা বলতে কী, যাকে আমরা সাধারণ ভাষায় 'গাঁজাখুরি' গল্প বলে বর্ণনা করে থাকি, তার একটা বিরাট ও বিশাল মোহ আছে। এবং এই মোহ উভয়ত-বিস্তৃত, যে বলে আর যে শোনে উভয়েই এটা উপভোগ করে। আপনি ছিপ ফেলে একটা মাছ ধরলেন, এ কথাটা বলবার মতোও নয়, শোনবার মতোও নয়। কিন্তু যদি বলেন — 'কী বলব ভাই, সেদিন বঁড়শিতে একটা মাছ গেঁথেছিলাম, বেটার পাক্কা সাড়ে ছ'মণ ওজন! রবিবারে বিকেলে গাঁথল, বেস্পতিবার পর্যন্ত খেলিয়ে শুক্রবারের ভোর রাত্রে বেটাকে টেনে তুললাম। চারদিন আপিস কামাই করে সিক্-রিপোর্টের দরুণ চারটে টাকা গচ্চা গেল।' — তাহলে আপনার বলেও আনন্দ, আমাদের শুনেও আনন্দ। অথচ কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়, রবিবার বাস্তবিকই আপনি দুটো বেলে মাছ ধরেছিলেন বঁড়শি দিয়ে। কিন্তু ঝোল, ঝাল বা ভাজা যেরূপেই তাদেরকে আপনি উদরস্থ করে থাকেন, তার চেয়ে এই 'গপ্প মারা'র স্বাদটা যে আপনি বেশি উপভোগ করেছেন, একথা আপনাকে মানতেই হবে।

অতএব সত্যের কঙ্কালটুকু মাত্র সম্বল করে থাকলে ইহজগতে

বেঁচে সুখ নেই। সত্য যখন কল্পনার রক্তে মাংসে ও মেদে পরিপুষ্ট হয়, তখনই সে সাহিত্যে ও ললিতকলায় স্থান পায়। আমরা যে তাচ্ছিল্য করে একে 'গাঁজাখুরি' বলি, এতে কল্পনার দৈববলে বলীয়ান সে-সত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না, গঞ্জিকাকেই অযথা সম্মানিত করা হয় মাত্র। গঞ্জিকার ধূমপ্রসাদেই যদি সত্যের কংকালকে রক্ত-মাংসে জীবন্ত করে' তোলা যেত, তাহলে অন্তত সংবাদপত্রের মালিকেরা আপিসের খরচায় তাঁদের রিপোর্টারগণের জন্যে গাঁজার ব্যবস্থা করতেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু বস্তুত, গল্পমারবার দেবদুর্লভ প্রতিভা যাঁদের আয়ত্তে, বাইরের কোনো উপকরণেরই তাদের প্রয়োজন হয় না। কলকাতার রাস্তায় একজন ফিরিওয়ালার সঙ্গে জনৈক খদ্দেরের দরদস্তুর নিয়ে বচসা হলে, কৃতী রিপোর্টার তাকে অনায়াসে সংবাদের পর্যায়ে এনে ফেলতে পারেন, এবং পরদিন প্রাতে আমরা খবরের কাগজে পড়ে রোমাঞ্চিত হই যে 'গতকল্য ডালহৌসি স্কোয়ার হইতে শিয়ালদহ ষ্টেশন পর্যন্ত যাবতীয় ফিরিওয়ালা সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই অঞ্চলের যাবতীয় ক্রেতাকে আক্রমণ করে, এবং ক্রেতাগণও সঙ্ঘবদ্ধভাবে ইহাদের সম্মুখীন হয়। ভয়াবহ রক্তারক্তির সম্ভাবনা যখন প্রায় বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে তখন দূরে একখানি পুলিশের লরী দেখা যায়, এবং তদ্দৃষ্টে উভয় পক্ষই ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। সৌভাগ্যের বিষয় কেহই হতাহত হয় নাই।'

এটা একটা খবর। এ খবর পড়ার পর আমরা আফিসে এসে পার্শ্ববর্তী কেরানিকে বলতে পারি 'হ্যাঁ মশাই, কাল তো বিরাট কাণ্ড হয়েছিল দেখছি আপনাদের পাড়ায়, দিলেন না কেন বেটাদের আচ্ছা করে ঠুকে! বেটাদের বড় বাড় বেড়েছে।' ইত্যাদি।

দৈনন্দিন জীবনে যতটুকু ঘটে তা এতই সামান্য, এতই তুচ্ছ, যে যথাযথতার গণ্ডির মধ্যে তাকে বেঁধে রাখতে গেলে আমাদের পরস্পরকে বলবার আর বিশেষ কোনো কথাই থাকে না। এ জন্য সাহিত্যে যথাযথতার কোনো স্থান নেই। ইদানিং আমরা যাকে রিয়্যালিজ্‌ম্‌ বলে তারিফ করি, তার মধ্যেও কিঞ্চিৎ অতি-বাদের খাদ না মেশালে সেটা সাহিত্য হয়ে উঠতে চায় না; যেমন কিনা পাকা সোনার গয়না যদি গড়ানোও যায়, তবু সেটা আর ব্যবহার করা চলে না, নেহাৎই ঠুন্‌কো হয়ে দাঁড়ায়।

কথার যারা বড় কারবারী, অর্থাৎ কবি, কচিৎ কখনো দয়াপরবশ হয়ে তাদের রচনার তারিফ করলেও বাস্তব জগৎ কোনোদিনই তাদের বক্তব্যকে বিশেষ আমল দেয় না। ভারতচন্দ্র যখন বলেন,

বিননিয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।

কিংবা

মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া
এখনো কাঁপিয়া ওঠে থাকিয়া থাকিয়া।

তখন ভারতচন্দ্রের রচনার আমরা সুখ্যাতি করি বটে কিন্তু ধরে নিই বিদ্যার বেণীটা সাধারণ মেয়েদের বেণীর চেয়ে ইঞ্চি কয়েক হয়তো বড় ছিল। কেননা চুলের শোভার পক্ষে ঐটুকু দৈর্ঘ্যই যথেষ্ঠ। এবং ভারতচন্দ্র যাই বলুন বিদ্যার নিতম্ব সম্বন্ধেও আমরা অসাধারণ কিছু ভেবে নিতে পারি না। কিন্তু ভেবে দেখুন, ভারতচন্দ্র যদি এক কথায় বলে দিতেন যে বিদ্যা বেশ সুন্দরী মেয়ে ছিল, তাহলে কি আর বিদ্যাসুন্দর জমতো?

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই, গোটা কাব্য সাহিত্যটাই এইরূপ

অতিশয়োক্তিতে ভর্তি। রবীন্দ্রনাথ একজন্য অসঙ্কোচে এবং অকুতোভয়েই বলেছেন :

'সত্য থাকুন ধরিত্রীতে
শুষ্ক রুক্ষ ঋষির চিতে
জ্যামিতি আর বীজগণিতে
কারো ইথে আপত্তি নেই,
কিন্তু আমার প্রিয়ার কানে
এবং আমার কবির গানে
পঞ্চশরের পুষ্পবাণে
মিথ্যে থাকুন রাত্রিদিনেই।'

এবং তিনি গল্প রচনার-সম্বন্ধেও এই নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে গল্প লেখককে একটা শপথ নিতে হয় যে 'আমি সত্য কথা বলিব, কিন্তু সে-সত্য বানাইয়া বলিব।' জিনিস বানাতে গেলেই তাতে নানান বস্তু মেশাতে হয়, এক-আধটু বাড়াতে ও টানতে হয়, একথা সকলেই জানেন। যথাযথ, নিছক, নির্জলা, নির্ভেজাল সত্য দিয়ে কোনো কিছুই তৈরি হয় না। এমন কি, যে-সত্যে বিন্দুমাত্র খাদ নেই সেটা মোটেই সত্য কিনা সে-সম্বন্ধে লেখক-গোষ্ঠীর মনে সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। এ কারণে রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন, ঘটে যাহা তাই সত্য নহে, এ-কথা প্রত্যেক লেখকই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে বাধ্য।

জগতের সাধারণ লোক কবিদের এ-জাতীয় কথাবার্তায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে না, চতুর উক্তি বলে ধরে নিয়ে অনুকম্পা সহকারে ক্ষমা করে দেয়। কেন না কবিগোষ্ঠীর একজন শ্রেষ্ঠ মুখপাত্রের নিজস্ব স্বীকৃতি অনুসারে এরা বাতুলের সমগোত্রীয়।

কিন্তু গল্প-লেখক ও বাক্যবীরদের সম্বন্ধে তাদের পাহারা বড়ই সজাগ। অন্তত বাংলাদেশে এ সম্বন্ধে আমরা অতিমাত্রায় সাবধান। গল্পে-উপন্যাসে একটু বাড়িয়ে বানিয়ে লিখতে গেলেই সর্বনাশ। নানান পন্থীরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করলেও সকলেই একবাক্যে বলবেন—'এটা অসম্ভব, এটা অচল।' এঁদের বক্তব্য ও মত নবকুমার কবিরত্ন ওরফে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ব্যাখ্যা করে গেছেন—

'বস্তুতন্ত্র আমসত্ত্বে থাকিবেক আঁশ
আর খুঁজিলে আঁটিও পাবে করহ বিশ্বাস।'

এ কারণে, নিতান্ত দুঃখের বিষয়, বাংলা সাহিত্যে 'গাঁজাখুরি' নামে উপাদেয় গল্প-সাহিত্য আজো গড়ে উঠলো না। অথচ বাংলাদেশই হচ্ছে 'গাঁজা-খুরি' গল্পের আদি ও অকৃত্রিম দেশ। আমার মনে পড়ে আমাদের শৈশবে 'সন্দেশ'-এর পাতায় স্বর্গত সুকুমার রায় প্রায়ই আমাদের একটি করে গাঁজাখুরি গল্প পরিবেশন করতেন। একটি গল্প এখনো মনে আছে। বাংলাদেশের সনাতন খুড়ো মহাশয় একবার রাত্রে হঠাৎ চালের বাতায় ক্রমান্বিত খর খর আওয়াজ শুনে চমকে উঠে পড়লেন। কী ব্যাপার? পরদিন চাল ভেঙে তার বাঁশ গুলো কেটে দেখা গেল তার ভেতর এনতার ইয়া বড় বড় সব কই মাছ। কী করে কৈ মাছ চালের উপর এল? খোঁজ নিয়ে জানা গেল ঘর তৈরির সময় যেখান থেকে বাঁশগুলো কেটে আনা হয়েছিল, সে বাঁশঝাড়টা ছিল এক এঁদো পুকুরের মধ্যে। সেখানকার কৈ মাছ গুলো বাঁশের ফাঁকে ফাঁকে ডিম পেড়ে রেখে গিয়েছিল। সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে বড় হয়েছে। তাই চালের উপর কৈ।

দুঃখের বিষয় আজকালকার ছেলেদের কাছে আর কেউ এ-জাতীয়

স্বাস্থ্যকর গল্প করে না; কাগজে ছাপা তো অসম্ভব! অথচ ইংরেজি গল্প-সাহিত্যে আইরিশ লেখক লর্ড ডানসেনি ও ইংরেজি লেখক ডব্ল্যু ডব্ল্যু জেকব্‌স্‌ গাঁজাখুরি গল্প লিখে যে অনবদ্য রসের সৃষ্টি করে গেছেন একথা কারুরই অজানা নেই। ওডহাউস সাহেবের মালিনার তো গাঁজাখুরি গল্পেরই কারবারী। কিন্তু তাঁদের কেউ নিন্দে করে না। কিন্তু আমরা যদি বলি — 'কাল আমাদের বালিগঞ্জ পাড়ায় ভীষণ ভূমিকম্প হয়ে বাড়ি ঘর সব ধ্বসে পড়েছে, রাস্তা ঘাট বন্ধ, তাই আপিসে আসতে দেরি হল', তাহলে কোনো বড়, মেজো কিংবা ছোটো সায়েবই আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না; আর, কোনো মেয়ে এই গল্প শুনে উপযাচক হয়ে আমাদের বিয়ে করবে — মালিনারের আত্মীয়কে যেমন করেছিল — এ আশা তো দুরাশা মাত্র।

ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় মহাশয় গাঁজাখুরী গল্পে হাত দিয়েছিলেন। তাঁর অনবদ্য 'ডমরু চরিত' যে পড়েছে সেই বলবে এমন আর হয় না। কিন্তু তাঁকে যে কেউ আমল দেয় নি, তার প্রমাণ তাঁর নামই কেউ জানে না। ইদানিং একমাত্র অতুলনীয় লেখক পরশুরাম অত্যুক্তির ভিত্তিতে গল্প লিখে বড় নাম করতে পেরেছেন। 'সম্বুদ্ধ' এদিকে নজর দিয়েছিলেন, এবং কৃতিত্বও দেখিয়েছিলেন বড় কম নয়, কিন্তু তাঁর নামই বা আর ক'জনে করে?

আমাদের সাহিত্যে 'অতি'-গল্পের এ অভাবের মূলে আমাদের পাঠক সমাজের ঔদাসীন্য তো আছেই। কিন্তু এ কথাও অনুধাবন করা দরকার যে অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য কথাকে বাড়িয়ে বল্লেই কিছু সার্থক 'গাঁজাখুরি' গল্পের সৃষ্টি হয় না। আর্ট মাত্রই সেইখানে

সবচেয়ে সার্থক যার বেশিও বলা চলে না, কমও নয়। একটি সার্থক 'গাঁজাখুরি' গল্পের থেকে কিছুটা কমালে সেটা সাধারণ গল্পের পর্যায়ে নেমে আসে, কিছুটা বাড়ালে সে গল্প হয়ে দাঁড়ায় হাস্যকর বাতুলতা। অদ্ভুত ক্রিয়াকুশলী গোয়েন্দা হিসেবে রবার্ট ব্লেক ও মোহনের নাম সকলেই জানেন। কিন্তু এরা যতোই অদ্ভুত ও অসাধারণ কার্যকলাপে বিশেষজ্ঞ হোক, এদের কাহিনী না ভালো গোয়েন্দার গল্প, না ভালো গাঁজাখুরি গল্প। অপরপক্ষে ষ্টীফেন লীককের সেই গ্রেট্ ডিটেকটিভ্ যে মক্কেলের মান রক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত কুকুরের ছদ্মবেশে প্যারিস এগ্‌জিবিশানে গিয়ে শ্রেষ্ঠ কুকুরের পদক লাভ করে ফিরেছিল, সে সত্যিকারের রস পরিবেশন করে গেছে একথা কোনোদিনই কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

আমাদের দেশে 'গুল' জিনিসটার সমাদর এতো কম যে ভয় হয়, এরূপভাবে চলতে থাকলে কিছুদিন পরে বোধ হয় আমরা আপ্তবাক্য ছাড়া আর কিছু উচ্চারণই করব না। এটা সবিশেষ পরিতাপের বিষয়। আমি সাহিত্য-রসিক হিসেবেই যে এজন্য দুঃখ বোধ করছি তা নয়, যাঁরা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে উৎসাহী, তাঁদেরও এ-বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার। সকলেই জানেন রাজনীতির আসল জিনিসই হচ্ছে প্রোপাগাণ্ডা। আর 'গুলই' যদি না থাকে তো প্রোপাগাণ্ডা চলবে কী দিয়ে বলতে পারেন?